কিশোরদের একমাত্র
চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ
গোয়েন্দা মাসিক পত্র

চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত
শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র

সূচীপত্র

কিশোরদের একমাত্র গোয়েন্দা মাসিক পত্রের

গোয়েন্দা সংখ্যা

ছোট বন্ধুরা,

তোমাদের জন্যে এবারের উপহার চার্লস ডিকেন্সের প্রখ্যাত কাহিনী 'নিকোলাস নিকলেবি'। সেকালের ইংলণ্ডে বেসরকারী আবাসিক প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বাচ্চাদের ওপর শিক্ষাদানের নামে যে নির্মম অত্যাচার করা হ'ত তারই এক করুণ কাহিনী লিখেছেন চার্লস ডিকেন্স। এছাড়া শুরু হচ্ছে এডগার অ্যালান পো'র গল্প 'গুপ্তধন রহস্য' —পাতায় পাতায় ছবি। অদ্রীশ বর্ধনের নতুন গল্প, রহস্য গল্প, অলৌকিক কাহিনী আছে। 'বাদশাহী মোহর' চলছে, চলবে। নিয়মিত ফিচারগুলি আছে। নতুন সংযোজন ধাঁধা-বুদ্ধির খেলা। — সব দিক দিয়েই আকর্ষণীয় একটি সংখ্যা তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।

অমিতাভ সেন
প্রধান সম্পাদক

১৫ই মে ১৯৮২।

রহস্য উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত / বাদশাহী মোহর ২১৩
বীরু চট্টোপাধ্যায় / একটি কাটা হাতের ২১৯
ভৈরব হালদার / প্রতিশোধ ২২৪
অদ্রীশ বর্ধন / ঝিনুক নৌকার নায়ক ২২৮
মঞ্জিল সেন / হীরের আংটি ২৬২
অমলেন্দ্র ঘটক / ফিংগার প্রিণ্ট ২৩১

চার্লস ডিকেন্স
নিকোলাস নিকোলেবি
ভাষান্তর : ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসু ২৪৩

আকাশ সেন / গুপ্তধন রহস্য ২৬৭
জিম করবেট / রাজকুমার ২৩৭
সোহিনী পাল / মনে রেখো ২৭৬
ধাঁধা / বুদ্ধিযন্ত্র ২৩৬
টারজান কমিকস / ফাঁদ (৪) ২৭৮
কমিকস সিরিজ / বিষাক্ত ওষুধ রহস্য (৭) ২১৭
প্রতিযোগিতার
ফলাফল ২৮০

সোহিনী প্রকাশনী ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১
দাম—দুই টাকা

আগামী দিনের নাগরিকদের জন্য

তোমরা যারা আজকের কিশোর-কিশোরী তারাই আবার আগামী দিনের সুস্থ সবল নাগরিক। তাই তোমরা এখন থেকেই যদি তোমাদের প্রিয় শহর কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে শেখ তাহলে ভাল হয়, তাই না?

এই যেমন ধরো রাস্তা দিয়ে হাঁটছো, দেখলে রাস্তার পাশে জলের কল দিয়ে জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে—তুমি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে জলের অপচয় বন্ধ করলে। এর ফলে আরো কিছু লোক একটু বাড়তি জল পেলো।

আবার ধরো তোমার বন্ধুরা বা অন্য কেউ কলা বা ডাব খেয়ে কলার খোসা বা ডাবের খোলা রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলেছে—তুমি সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বারণ করবে। কারণ ঐ কলার খোসায় পা পিছলে যে কোন লোকেরই প্রাণান্ত হতে পারে। আর ডাবের খোলা? পথ অপরিষ্কার করবে।

আবার হয়তো দেখলে, আশে পাশের বাড়ী থেকে কেউ কেউ জঞ্জাল রাস্তায় ফেলেছে—তুমি কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ধারে কাছের ভ্যাটে জঞ্জাল ফেলতে বলবে। নতুবা পথচারী ও যানবাহনের রাস্তায় চলতে অসুবিধা হবে। তোমরা তো কখনও এরকম করবেই না বরং অন্য কাউকেও করতে দেখলে নিষেধ করো।

কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত

কেন ভাবছেন?

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য

'পিয়ারলেস'-এ যোগ দিন

'পিয়ারলেস'

সহস্র সহস্র বেকার যুবকদের অন্তরে

আশার আলো জ্বেলেছে

PRASA

দি পিয়ারলেস জেনারেল

ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ

পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

আগের কথা ঃ

[বিপ্লব ও তার মা রত্না দেবীদের পুরোন বাড়ি কিনতে এসে ক্রেতা খুন হল, লাশ উধাও। বিপ্লব বিরূপাক্ষ সেনকে নিয়ে এসেছে। একটা লাস সনাক্ত করে থানা থেকে ফেরার পথে বিপ্লব ও তার মাকে কিডন্যাপ করা হল। রত্নাদেবী ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন। বিপ্লবকে ওরা বেলগাছিয়া অঞ্চলে একটা বাড়িতে এনেছে। বিষেণ সিং বিপ্লবকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। বিপ্লবের জুজুৎসুর প্যাঁচে আছাড় খায়। রত্না দেবীর বাড়ির সামনে একজন বীরেশ্বর রায় এসেছে, বাড়িটা কিনবে। বিরূপাক্ষ এসে পড়েছে। রত্নাদেবী বাড়ি বিক্রী করবেন না। বীরেশ্বর গ্যাস বোমা ছোড়ে। রত্না দেবীকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। এক বিরাট গোখরো সাপ দেখে ওরা পালিয়ে যায়।

বিপ্লবকে যারা কিডন্যাপ করেছে তাদের কাছ থেকে রত্না দেবী চিঠি পেলেন বাড়ি বিক্রি করতে যদি তিনি রাজি না হন বিপ্লবের মৃত দেহ তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। রত্নাদেবীকে আশ্বস্ত করে বিরূপাক্ষ চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরে দরজার কড়া নড়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করতেও কেউ সাড়া দিল না।]

দরজার কড়া দুটো আবার খট্ খট্ শব্দ করে উঠ্লো।

রত্নাদেবী আর একবার জানালা পথে তাকালেন। ক্রমশঃ রাতের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

চিরদিনই খুব সাহস রত্না দেবীর।

মায়ের অমন সাহস না হলে বিপ্লবের মত সাহসী ছেলে হয়!

নচেৎ অন্য কেউ হলে যেসব ঘটনা ঘটেছে সারাদিন ধরে হয়ত খিল তুলে সর্বক্ষণ বসে থাকত।

আবার খট্ খট কড়া নাড়ার শব্দে রত্নাদেবী বললেন, সাড়া না দিলে দরজা খুলবো না।

দরজাটা খুলুন—

ভারী কর্কশ একটা পুরুষের গলা শোনা গেল।

—কে?

—আমাকে আপনি চিনবেন না। দরজাটা খুলুন —জবাব এলো।

—নামটা আমি শুনতে চাই রত্না দেবী বললেন।

—নামটা বললে কি চিনবেন আমাকে? আমার নাম রাখাল সামন্ত।

—কোথা থেকে আসছেন।

—বেলগাছিয়া থেকে। দরজাটা খুলুন জরুরী প্রয়োজনীয় কথা আছে।

—যা কথা আছে আপনি দরজার বাইরে থেকেই বলুন আমি শুনতে পাবো।

—আমি আপনার ছেলে বিপ্লবের কাছ থেকে আসছি—খুলুন দরজাটা—

রত্না দেবী এবার দরজার খিলটা খুলে দিলেন।

লোকটা এসে ঘরে ঢুকল।

রোগা ঢ্যাঙ্গা চেহারা।

মুখটা কেমন চোয়াড়ে—পরনে একটা ময়লা সাদা জীনের প্যান্ট, একটা খাকী হাওয়াই সার্ট গায়ে। পায়ে চপ্পল।

—এই নিন, পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল লোকটা।

—কি এটা।

—আপনার ছেলে বিপ্লব আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছে—

—চিঠি। আমাকে—

—হ্যাঁ পড়ে দেখুন না।

ভাঁজ খুলে রত্না দেবী চিঠিটা পড়লেন।

মা,

বাড়িটা তুমি বিক্রী করবে একটা সাদা কাগজে লিখে এই লোকের হাতে দিও—বিপ্লব।

—কিন্তু এ চিঠিতো আমার ছেলের লেখা নয়, রত্নাদেবী বললেন।

—কি বলছেন আপনি, চিঠি বিপ্লবই দিয়েছে—

—না, এ আমার ছেলের হাতের লেখা চিঠি নয়। আমার ছেলের হাতের লেখা আমি চিনি।

—ভাল করে দেখুন, আপনার ছেলেরই হাতে লেখা চিঠি—রাখাল সামন্ত বলল।

—না।

—দেখুন রত্না দেবী, আপনি কেনারাম সরখেলকে চেনেন না, সে সাংঘাতিক লোক একটা—এই চিঠিতে যা লেখা আছে সেই মত কাগজ যদি না লিখে দেন সরখেল আপনার ছেলেকে মেরে ফেলবে।

—বেশত।

—মানে আপনার ছেলের প্রাণের চাইতে এই ভাঙ্গা বাড়িটি আপনার কাছে বড় হলো। আপনি মা হয়ে এই কথা বলছেন।

—আপনি যেতে পারেন, আমি কিছু লিখে দেবো না।

—ছেলের প্রাণ আপনি চান না।

—না।

—বেশ তবে আর কি হবে। আমি চললাম, যথা সময়ে আপনার ছেলের মৃত দেহ আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে—

হঠাৎ ঐ সময় রত্না দেবী বললেন, তুই রঘু না—

—অ্যাঁ থমকে যায় যেন হঠাৎ রাখাল সামন্ত, রত্না দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

রত্না দেবী তৎক্ষণে রাখাল সামন্ত বলে পরিচয় দিলেও একদা পুরাতন ভৃত্য রঘুকে চিনতে পেরেছেন।

মাত্র দশ মাস আগে রঘুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

—কি পাগলের মত যা তা বলছেন, রাখল সামন্ত বললে।

—তুই আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস নি। তোর মুখে কিছুটা দাড়ি গজালেও তোকে আমি চিনতে পেরেছি রঘু—আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না হতভাগা। হারামজাদা তোর এতদূর স্পর্ধা তুই এক কালে আমার এখানে চাকর ছিলি সে সব কথা ভুলে গিয়ে—নিমকহারাম—

—দেখুন মা জননী আপনি ভুল করছেন—

—ভুল করছি!

—হ্যাঁ আমি রঘু নই, আমার নাম রাখাল সামন্ত মেদিনীপুরে বাড়ি।

রত্না দেবী এবার আরো জোর গলায় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন ভুল করেছি কিনা দাঁড়া তুই, আমি থানায় একটা খবর পাঠাচ্ছি।

—থানায় খবর পাঠাতে চান পাঠাতে পারেন তা আবারও বলছি আপনি ভুল করছেন আচ্ছা আমি চলি—

—দাঁড়া রঘু—তুই কি ভুলে গেছিস তোর মরণাপন্ন টি, বি রোগী একমাত্র ছেলেকে আমি বড় ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ দিয়ে একরাশ টাকা খরচ করে বাঁচিয়ে ছিলাম—

ঐ কথার পরে রাখাল সামন্ত যেন হঠাৎ কেমন মিইয়ে যায়। কোন প্রতিবাদই তার কণ্ঠ দিয়ে আর বের হয় না। রত্না দেবী বললেন, কত টাকা দিয়েছে তারা তোকে যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছিস—বল হারামজাদা তোর কত টাকার দরকার আমি দেবো তোকে।

—শুনুন আমি আবারও বলছি আমি রঘু নই রাখাল সামন্ত। হয়ত এমনও হতে পারে রঘু আমারই মত দেখতে ছিল।

আমি যাচ্ছি—তবে একটা কথা যাবার আগে বলে যাই যারা আপনার এই বাড়ি পুরাতন গুপ্তধনের জন্য কিনতে চায় তারা—

—কি তারা, তারা কে। চিনিস তুই তাদের—

—তার নাম বীরেশ্বর রায়।

—জানিস তুই কে ঐ তোর বীরেশ্বর রায়।

—তা বলতে পারবো না। লোকটা খুব বড় লোক অঢেল টাকা লোকটার। তারই নিযুক্ত লোকজনেরা চেষ্টা করছে তার হয়ে এ বাড়িটা আপনাদের কিনতে—

—এ বাড়িত আমি বেচবো না—

—বেচতে শেষ পর্যন্ত আপনাকে হবেই।

—জোর করে বেচাবে—

—ঐ যে আপনার ছেলেকে আটকেছে। ঐ ছেলের জন্যই আপনাকে বেচতে হবে এ বাড়ি শেষ পর্যন্ত। কেন ঝামেলা করছেন, বেচে দিন। কি হবে এ পুরাতন বাড়ি একটা রেখে—অন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে সাপের বাসা।

—ঠিক আছে তুই যা তোর মনিবকে গিয়ে বলিস এ বাড়ি প্রাণ থাকতে আমি বেচবো না।

—তাই বলবো—রাখাল চলে গেল।

রত্না দেবী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মধ্যে। সকালের রোদ এসে তখন জানালা পথে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।

বিপ্লব যখন বলল কাগজে সে সই করে দেবে কিন্তু সে হাতে হাতে টাকাটা চায়—ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একটু থমকে গেলেন। কেমন যেন একটু ইতঃস্ততঃ ভাব।

বিপ্লব বলল, কি হলো আসুন আপনার কাগজ যে কাগজে আমার সই আপনার চাই।

হ্যাঁ এই যে পকেটেই আছে সে কাগজ।

বলতে বলতে ভদ্রলোক একটা ভাজ করা ডেমি কাগজ জামার পকেট থেকে বের করলেন। বললেন, এই কাগজে সই করে দাও।

—কিন্তু টাকাটা।

—পরে পাবে—

—উহুঁ তা হবে না এক হাতে টাকা অন্য হাতে সই—

—আমি কি মিথ্যা বলছি।

—মিথ্যা সত্য আমি যাচাই করতে চাই না। টাকা দিন সই করে দিচ্ছি আপনার কাগজে।

—বেশ এই নাও চেক অন্য পকেট থেকে একটা 'চেক' বের করলো ভদ্রলোক।

—চেক নেবো না—

—কেন—

—না। নগদ টাকা চাই।

—অত টাকা নগদ কারো কাছে থাকে নাকি।

ভদ্রলোকের কথাটা শেষ হলো না, হঠাৎ কোথা থেকে একটা কাচের বল এসে ওদের সামনে মেঝেতে আছড়ে পড়লো।

দুম করে একটা শব্দ তারপরই দেখতে দেখতে ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল।

কেবল ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

বিপ্লবের নাকে ধোঁয়াটা যেতে মাথার মধ্যে যেন কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে, নিঃশ্বাস যেন কেমন বন্ধ হয়ে আসে সেই সঙ্গে। হাত পা কেমন শিথিল, ধীরে ধীরে বিপ্লবের দেহটা মেঝতে এলিয়ে পড়লো। জ্ঞান লুপ্ত হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা অট্টহাসির শব্দ তার কানে এলো—হাঃ হাঃ হাঃ।

বহুদূর থেকে যেন একটা প্রেতের নিষ্ঠুর হাসি।

ভদ্রলোকও ততক্ষণে মেঝের পরে এলিয়ে পড়েছে।

তারও কানে যায় সেই হাসির শব্দ।

ধীরে ধীরে এক সময় বিপ্লবের যখন জ্ঞান ফিরে এলো, সে এদিক ওদিকে তাকায়।

এ কোথায় সে।

একটা চেয়ারে সে বসে, তার পায়ে শিকল।

এ অবস্থা তার কেমন করে হলো।

বহুদূর হতে যেন কার কণ্ঠ স্বর ভেসে এলো খোকা শুনচো খোকা।

একটা মেয়েলি মিষ্টি গলার স্বর।

—কে।

—আমি, পূর্ববৎ মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—তুমি—আমি কোথায়!

[চলবে]

লোকটা ছুটে বেরিয়ে গেল
কি হয়েছে?
আমাদের কন্ট্রোলার!
ওরা দুজনে বেরিয়ে এলো
ধরতে হবে ওকে!
রাজপথে পৌঁছে দেখলো----
মারামারি হচ্ছে
মাংসের দোকানে লুট চলছে, কয়েকজন বাধাদেবার চেষ্টা করছে - -
আ-আ-আ
কনস্টেবল জোন্স করছ কি?
যা-যা-যা
থাম, কি হয়েছে তোমাদের?
এগোলো জলদি
দুই বন্ধু ক্যারাটের কৌশল প্রয়োগ করে

ক্যারাটে চলছে!
ছ'জন ধরাশায়ী – বাকিরা পালাচ্ছে। হাতে মাংসের টুকরো ---
বাকি তিনজনকে দেখাচ্ছে ওরা
তোমরা এর মধ্যে আছ?
না- না,-
সবাই যেন ক্ষেপে গেছে
সকাল থেকেই শুরু হয়েছে!
শুধু ওভার কোট পরে এল জোন্স
রুটিওলার ভ্যান লুট হল
পুলিসও নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে...
ওরা বুঝলো এই তিনজন মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে..
লণ্ডনের ফোন পেলুম না, কেউ নেই...
যারা পাগল হয়নি তাদের স্কুল বাড়িতে এনে রেখেছি –
চলুন, দেখে আসি
স্কুল বাড়িতে হতাশার চিহ্ন
আপনারা গভর্নমেন্টের লোক কি ব্যবস্থা করেছেন?
আমার স্বামী চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে চলে গেল
সবাই চুপ করুন একটু!

[চলবে]

(রহস্য-গল্প)

একটি কাটা হাত-এর বিস্ময়কর কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

ফরাসী ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তখন আমি উপসাগরের তীরস্থ শহর অ্যাজাসিও'র রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আমার ওপর ভার ছিল 'ভেনডেটা'—বিচারের। অর্থাৎ কর্সিকার সেই পুরনো প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, যার দ্বারা আত্মীয় নিধন হলেও পরবর্তী যে-কোন পুরুষে যে-কোন বংশধর তার বদলা নেয়। অদ্ভুত,

আশ্চর্য, আপাত সম্পর্কবিহীন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত এই 'ভেনডেটা'র ব্যাপারে, কত নর নারী, শিশুর গলাকাটা অবস্থায় মৃত্যু দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমানে শত্রুতার কোন লেশমাত্র নেই, অথচ খোঁজ করলে দেখা যায় এক পুরুষ পূর্বে আততায়ীর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিহত মানুষটির বংশের কেউ হত্যা করেছিল, তাই দীর্ঘকাল বাদে এই বদলা।

বছর দুই হল আমি এ শহরে এসেছি। একদিন শুনলাম জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক এসে উপসাগরের তীরে একটি ছোট্ট ভিলা-য় বহু বছরের লিজ-এর কড়ারে বসবাস শুরু করেছে। সঙ্গে আছে মার্সাই থেকে আনা একটি ফরাসী ভৃত্য।

আলোচনায় শোনা গেল, ভদ্রলোক নাকি বাড়ি থেকে বেরই হয় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না, আর শহরের মধ্যেও কখনো ঢোকে না। শুধু প্রতিদিন সকালে দু তিন ঘণ্টার জন্য রাইফেল পিস্তল নিয়ে আশেপাশে শিকার করে বেড়ায়!

নানা গুজব শুরু হল এই বিদেশীর সম্পর্কে। কেউ বলছে লোকটা একজন বিরাট রাজনৈতিক নেতা, সহকর্মীদের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় দেশ ত্যাগ করে এখানে এসে বসবাস করছে। অন্য দল বলছে, এই মানুষটি একজন সাংঘাতিক অপরাধী, কোন অঘটন ঘটিয়ে এখানে এসে অজ্ঞাত বাস করছে। তারা অপরাধ কাহিনীর ভয়াবহ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজে কাজেই এই লোকটির সম্বন্ধে আমারও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু কার্যত চেষ্টা করতে গিয়ে আমি বিফল হলাম। লোকটি তার নিজ নাম বলেছে সার জন রোওয়েল।

অতএব আমাকে শুধু দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। আমার কিন্তু মানুষটাকে তেমন সন্দেহজনক ব্যক্তি বলে মনে হল না। অথচ তার সম্বন্ধে গুজব চলতে লাগলো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। সে গুজব বেড়ে বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে বাধ্য হয়ে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মনস্থ করলাম। এই ভেবে ওঁরই এলাকায় শিকার করতে আরম্ভ করলাম নিয়মিত ভাবে।

বহুদিন ধরেই আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে আমি একদা ইংরেজ ভদ্রলোকের সামনেই কতকগুলো পাখিকে গুলি করে মারলাম। আমার কুকুরগুলো মৃত পাখিদের নিয়ে এল আমার কাছে। পাখিগুলি নিয়ে আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে, বেআদপির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে সেগুলো তাঁকে উপহার দিতে চাইলাম। সার জন রোওয়েল সেগুলো গ্রহণ করলেন।

ভদ্রলোক বিরাটকায় পুরুষ। লাল চুল, লাল দাড়ি অতি দীর্ঘ দৈত্যাকার। কিন্তু চেহারার অনুপাতে আসলে ভদ্রলোক খুবই বিনয়ী মানুষ। ইংরেজ-জনসুলভ কাঠিন্য তাঁর মধ্যে একেবারেই নেই। তিনি আমাকে ধন্যবাদান্তে সাদরে গ্রহণ করলেন।

এরপর মাসখানেক সময়ের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বার পাঁচ ছয় মাত্র সামান্য আলাপ পরিচয় হল।

অবশেষে এক সন্ধ্যায় ওঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম তিনি বাড়ির বাগানে একটা চেয়ারের মধ্যে বসে পাইপে ধূমপান করছেন। আমি অভিবাদন জানাতে আমাকে এককাপ কফি খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

বিনয়ী ভদ্রতায় আমায় গ্রহণ করলেন তিনি। ফরাসী দেশ এবং কর্সিকার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই দুটি দেশ এবং সমুদ্র উপকূল নাকি তাঁকে যারপর

নাই মুগ্ধ করেছে।

আমি খুব সন্তর্পণে ওঁর বিষয়ে বিশদভাবে জানবার উদ্দেশ্যে ওঁর কার্যাবলী ও প্রিয় খেলাধূলার বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে বেশ সরাসরি ও খোলাখুলি ভাবেই কথা আরম্ভ করলেন। আফ্রিকা, ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশেই নাকি তিনি ভ্রমণ করেছেন।

—আমার জীবনে বহু অ্যাডভেঞ্চারই এসেছে।

বলে তিনি শিকার বিষয়ে বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনালেন। জলহস্তী, বাঘ, হাতি এমনকি গরিলার অনেক গল্প করলেন।

—এগুলো তো সাংঘাতিক সব জানোয়ার, আমি বলে উঠলাম।

তিনি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, বললেন, না না মঁসিয়ে, মানুষই হল সবচেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী। আমার প্রায়শ শিকারই ছিল মানুষ!

শুনে আমি বিস্মিত হলাম সন্দেহ নেই। এরপর তিনি আমায় তাঁর অস্ত্র সংগ্রহ দেখালেন। বিভিন্ন ধরনের বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ও রিভলবার। তাঁর বসবার ঘরের দেওয়াল কালো সিল্কের পর্দাঘেরা।

দেওয়ালের মাঝামাঝি একটি বস্তুর প্রতি সবিস্ময়ে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। লাল ভেলভেটের ওপর কি একটা কালো রঙের বস্তু আটকানো রয়েছে। আমি কাছে গিয়ে সাতঙ্কে দেখলাম, সেটা একটা কর্তিত মানুষের হাত। কোন পুরুষ মানুষের হাত। হাতের কঙ্কাল। কালো হয়ে গেছে, কিছু কিছু শুষ্ক মাংসপেশিতে শুকনো রক্ত কালো হয়ে আছে। কনুইয়ের কাছ থেকে কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে যেন হাতটিকে এক কোপে কেটে নেওয়া হয়েছে।

কাটা হাতটির কব্জিতে একটা বিরাট আকারের শেকল রিভেট করা অবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে ভাল ভাবে আটকে ঝোলানো অবস্থায় রয়েছে। এতবড় শক্ত শেকল যে, সেটা দিয়ে বোধকরি একটা হাতিকে বাঁধা চলে।

—এটা কি বলুন তো? আমার সবিস্মিত প্রশ্ন।

—ও ছিল আমার ভয়ংকর শত্রু, শান্ত ধীর কণ্ঠে ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, এটা আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে। তরোয়ালের এক কোপে কেটে ফেলে, হাতটাকে হপ্তখানেক রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা আমার শিকার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আমি সেই বীভৎস বস্তুটি একবার স্পর্শ না করে পারলাম না। স্পর্শ মাত্র গা শিউরে উঠলো। অস্বাভাবিক দীর্ঘ আঙ্গুলগুলো দৃঢ় শুষ্ক মাংসপেশী দ্বারা আটকে রয়েছে। হাড়ের এখানে সেখানে শুকনো চামড়া লেগে রয়েছে। বিকৃত ঐ হাতটার পানে তাকালেই মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে আসে। দেখলেই মনে হয় ওটা যেন একটা ভয়াবহ প্রতিহিংসার প্রতীক।

—লোকটা নিশ্চয়ই প্রবল শক্তি-শালী ছিল? আমি জিগ্যেস করি।

—হ্যাঁ, তা অবশ্যই ছিল, আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে ইংরেজ ভদ্রলোক জবাব দিলেন, কিন্তু আমি যে ওর চেয়েও শক্তিশালী সেটা প্রমাণ করেছি। আমি এটাকে ভালভাবে বেঁধে রাখবার জন্যে কঠিন শেকল লাগিয়েছি।

রহস্য করছেন ভেবে আমি বললাম, কিন্তু এখন তো শেকলটার আর কোন প্রয়োজন দেখিনা, কাটা মৃত হাতটা তো আর পালিয়ে যেতে পারবে না।

—না, একথা ঠিক নয়। এটা সব সময়েই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। শেকলটার তাই অত্যন্ত

প্রয়োজন আছে। বেশ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন সার জন রোওয়েল।

আমি হতবাক হয়ে ভদ্রলোকের পানে বারকয়েক তাকালাম। আমি কি একজন বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের মুখোমুখি হয়েছি? না কি ভদ্রলোকের এটা একটা সস্তা রসিকতা মাত্র।

ভদ্রলোকের মুখে কিন্তু কোন ভাব পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল না। মুখভাব তেমনি গম্ভীর, তেমনি শান্ত, তেমনি সৌজন্য-স্নিগ্ধ।

সেই যাই হোক। আমি তাঁর অস্ত্র সংগ্রহের প্রশংসা করলাম। লক্ষ্য করলাম এ ঘরে তিন তিনটে পিস্তল রয়েছে। মনে হল, লোকটি যেন কোন অজ্ঞাত আক্রমণের আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে আছেন।

এরপর আমি কয়েকবার ওঁর বাড়ি গিয়েছি। তারপর আর যাইনি। গুজব থেমে এসেছে। ভদ্রলোক আর রহস্যময় নেই কারুর কাছে।

এর বছরখানেক বাদে একদিন সকালে আমার চাকর আমায় জাগিয়ে তুললো ঘুম থেকে। শোনালো অভাবিত এক দুঃসংবাদ। সার জন রোওয়েল নাকি গতরাত্রে নিহত হয়েছেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কমিশনার এবং চীফ ইন্সপেক্টর সহ গিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি পৌঁছিলাম। মার্সাই থেকে আসা ফরাসী ভৃত্যটি শোকে মুহ্যমান হয়ে কাঁদছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রথমটা তাকেই সন্দেহ করা হয়েছিল। পরে বোঝা গেল লোকটা প্রকৃতই নির্দোষ। আমরা অবশ্য ইংরেজ ভদ্রলোকের আততায়ীর সন্ধান কোনদিনই করতে পারিনি।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখি সার জনের মৃতদেহটা মেঝেতে চিৎ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওয়েস্ট কোটটা তাঁর ছিন্নবিচ্ছিন্ন। মনে হয় মৃত্যুর পূর্বে খুবই ঝটাপটি হয়েছিল। হুটোপুটির নিদর্শন চতুর্দিকে।

শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ভদ্রলোকের। তাঁর কালো হয়ে যাওয়া, বীভৎসভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠা মুখে অবর্ণনীয় আতঙ্কের ছাপ ফুটে রয়েছে। মৃতের কণ্ঠদেশে পাঁচটি রক্তাক্ত গর্ত। মনে হয় সেগুলো যেন কোন লৌহ শলাকা দিয়ে বিদীর্ণ করা হয়েছে।

একজন ডাক্তার বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলো মৃত দেহ। অবশেষে বললে, দেখে মনে হয়, কোন কঙ্কাল মুষ্ঠি যেন ভদ্রলোককে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলেছে।

শুনে তৎক্ষণাৎ একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাকালাম দেওয়ালের দিকে। আশ্চর্য। আধা-কংকাল হাতটাতো সেখানে নেই! শুধুমাত্র শেকলটা ভাঙা অবস্থায় ঝুলছে!

তখন আমি নিচু হয়ে দেখলাম মৃতের দাঁতের ফাঁকে আটকে রয়েছে আধা-কংকাল হাতের একটি আঙুল, ছিন্ন অবস্থায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত তল্লাসীতে কোন কিছুই আবিষ্কৃত হল না। দরজা জানালা অক্ষত। পাহারাদার কুকুর দুটিও অচঞ্চল ছিল। তারাও কিছু টের পায় নি বোঝা গেল।

চাকরের মুখে শোনা গেল, গত মাসখানেক যাবত তার মালিক যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বহুপত্র তিনি পেয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে তিনি চাবুক নিয়ে শৃংখলাবদ্ধ কাটা হাতটাকে নির্মমভাবে চাবকাতেন। কিন্তু হত্যাকালীন ওটা দেওয়াল থেকে সরে গেছে। কিভাবে সরলো কেউ তা জানে না।

ভদ্রলোক অধিক রাত্রে শুতে যেতেন। ভেতর

থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। হাতের কাছে সদা সর্বদা পিস্তল রাখতেন। মাঝে মাঝে ঘরের ভেতর থেকে তাঁর উত্তেজিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যেত। মনে হত তিনি যেন কার সঙ্গে প্রচণ্ড কলহ করে চলেছেন।

কিন্তু দুর্ঘটনার রাতে তিনি কোন আওয়াজ করেন নি। সকালে চাকর জানালা খুলতে এসে আবিষ্কার করে যে মালিক নিহত হয়েছেন। কাউকে সন্দেহ করবার মত নেই।

সারা দ্বীপটিতে তন্ন তন্ন তদন্ত করেও কিন্তু কোন কিছুর কিনারা করা গেল না।

এ ঘটনার তিনমাস বাদে এক রাত্রে আমি এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, ঐ বীভৎস ভয়াবহ কর্তিত হাতটা আমার মশারীর মধ্যে ও ঘরের দেওয়ালে কাঁকড়া বিছা বা মাকড়সার মত বেয়ে বেয়ে বেড়াচ্ছে। তিনবার আমি জেগে উঠলাম, তিনবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তিন বারই আমি ঐ জঘন্য হাতটাকে আঙুল চালিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে দেখলাম।

পরের দিন কতগুলো লোক সেই কাটা হাতটাকে নিয়ে এল আমার কাছে। ওটাকে পাওয়া গেছে সার জন রোওয়েলের সমাধির ওপর। দেখা গেল হাতটার প্রথম আঙুলটাই নিরুদ্দিষ্ট।

এই হল আমার কাহিনী। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন মহিলা প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন এটা কোন ব্যাখ্যা হল না। আপনি এ ব্যাপারে কি অভিমত পোষণ করেন তা যদি না বলেন তো আমরা কেউ আজ রাত্রে ঘুমতে পারব না।

ম্যাজিস্ট্রেট হাসলেন, বললেন, ম্যাডাম আমি হয়ত আপনাদের আতঙ্কমাখা দুঃস্বপ্নকেই ভঙ্গ করব। আমার মনে হয় কাটা হাতের মালিক জীবিতই আছে এবং সে অপর আস্ত হাতখানি সহ খুঁজতে এসেছিল কর্তিত হাত খানিকে। তবু আমি ভেবে পাচ্ছিনা কিভাবে সে কার্যসমাধা করলো।

—উহু এটাও বিশ্বাস যোগ্য ব্যাখ্যা নয়, অপর মহিলা বললো।

—আমি তো বলেছি যে আমার ব্যাখ্যায় আপনারা সন্তুষ্ট হবেন না। এ একটা অলৌকিক রহস্য, যা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না, বলে ম্যাজিস্ট্রে-তেমনি হাসতে লাগলেন।*

* মোপাঁসার একটি গল্প অবলম্বনে

প্রতিশোধ

একটা গল্প লিখবেন ?

ভৈরব প্রসাদ হালদার

কিসের গল্প ?

ভূতের !

ভূত ! অশরীরী আত্মা ! মৃত্যুর পরে যাদের গতি হয় না এমন সব মানুষের আত্মা না-কি এই সংসারের হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। তাদের অপূর্ণ আশা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের অশরীরী অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাদের দেখা যায় না সব সময়। তাদের দেখতে পায় না জীবন্ত মানুষ। কিন্তু তবু তারা আছে। হাটে-মাঠে-বাটে তারা ঘুরে বেড়ায়। জন্ম নেয় মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে। তাদের এই থাকা-না-থাকা নিয়ে কোন তর্ক চলে না। কেননা তাদের থাকাটা যেমন প্রমাণ করা যায় না তেমনি যায় না প্রমাণ করা তাদের না-থাকাটা। তর্কে শুধু তর্ক বাড়ে।

কিন্তু আমি ত ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। যা' আমার দেখা-জানার বাইরে তাতে বিশ্বাস করতে দ্বিধা জাগে। ধুৎ ! ও সব কাহিনী। ভূত কখনো সত্যি হয় না-কি ! গাঁজাখুরি ব্যাপার। অলস মস্তিষ্কের রটনা।

অথচ··· !

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম !

রাত গভীর। আলোহীন ঘরের পরিবেশ।

বাইরে কালো আঁধারের পর্দা ঝুলছে। বোধ হয় আজ অমাবস্যার রাত। আর না হয় আকাশ-জোড়া মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। যেন আজ রাতে হাওয়া-ও নিথর।

সহসা আমার মনে হ'ল কে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি: নগ্নদেহী এক জোয়ান, পরনে ময়লা আটহাতি একখানা ধুতি মালকোচা আঁটা। ইয়া গালপাট্টা। মাথায় খস খসে বাবরি চুল। ভাঁটার মতন গোল গোল দু'টো চোখ, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। রক্ত বর্ণ। দেহের পেশীতে দুরন্ত ক্রোধের প্রকাশ।

: না, দিমু না মোরা। দিতে পারুম না।

কাছারি ঘরেরর উঁচু তক্তপোশের গদিতে তাকিয়া ঠেস-দেওয়া এক জবর দস্ত পুরুষ। হাতে গড়-গড়ার সোনার জরি জড়ানো লম্বা নল। বয়সে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু দেহের শক্তি এবং রূপে টান ধরে নি। ভরাট দশা সই চেহারা। টকটকে ফরসা রঙ। পরনে সৌখিন দামী ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবী। তার ওপর দেড় হাজারি নক্সা-তোলা শাল। বাঘের মতন ভারি মাংসল মুখে এক জোড়া পাকানো গোঁফ।

মহাল দেখতে এসেছেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

বাদা অঞ্চলে তাঁর বিস্তৃত জমিদারি। কলকাতায় পাটের ব্যবসা। যেমন ধন-সম্পদ, তেমন রাশভারি মানুষটার অখণ্ড প্রতাপ। লোকে তাই বলে রাজা। লোকের দেওয়া এই খেতাব সরকারি দপ্তরও বুঝি মেনে নিয়েছে।

আসনে সোজা হয়ে বসলেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

: কি পারবি না রে, ছোঁড়া? কার ব্যাটা তুই?

ভরাট গলার বাজের মতন আওয়াজ।

কাছারি বাড়িখানা যেন গমগম করে উঠল।

ভয়ে সিঁটিয়ে উঠল চত্বরে জমা শত-খানেক গ্রামীণ মানুষ।

: নামে কাম নাই। এ বছর খাজনা মোরা দিমু না। খাজনা মোরা দিমু না। জোয়ান ছেলেটা বলে উঠল।

: চোপরাও! বেল্লিক কোথাকার! গর্জন করে করে উঠলেন রাজা।

জমায়েত মানুষগুলোর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল ভয়ে।

বুড়ো নায়েব হরিবাবু সামনে দাঁড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে বললে—কালিমুদ্দিন শেখের ছেলে সাহাবুদ্দিন। লোক খেপিয়ে বেড়ায়।

: বটে! খাজনা দেবে না! আব্দার! সিধু, ছোঁড়াটাকে সুপুরি গাছে বেঁধে চাবুক মার!

: হুজুর! মাপ করবেন! খাজনা মোরা দিমু! রাজার জমিনে বাস করি, খাজনা দিমু না কি কইতে পারি? তবে হুজুর, বিচার করেন। বানে ডুবল জমিন এ সনে। ফসল ফলে নাই। জমিনে এক হাঁটু লোনা জল। ধানের বিলকুল চারা মজে হেজে গেল! তাই এই সনের খাজনাটা মাপ করেন। এক মোড়ল চাষী আবেদন জানাল।

আরো অনেকে ঘাড় নেড়ে তাকে সায় দিল।

প্রতি সনের মতন এ সনেও মহালে এসেছেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ। আজ পয়লা পৌষ.... পুণ্যাহ। নায়েব গ্রামে গ্রামে ঢোল সহরৎ করে জানিয়েছে, রাজা আসছে। নজরানা নিয়ে এস তোমরা। রাজার জমিতে বাস কর, চাষ কর,...সেই জমির খাজনা মেটাও।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ পুণ্যাহের পুজো-পাট সেরে বসেছেন কাছারি বাড়ির দরবারে।

বাদা অঞ্চলের দূর দূর গ্রাম থেকে আসছে প্রজারা। রাজ-দর্শন করতে হলে চাই নজরানা! প্রজারা ক্ষমতা অনুযায়ী নজরানা দিচ্ছে।

খাজনা শোধ করছে। মহারানীর রূপোর টাকায় তেল সিঁদুরের প্রলেপ মাখিয়ে ছাপ তুলছে খাজাঞ্চি হাল সনের খাতায়। প্রজার নাম-ধাম জমি-জেরাতের বর্ণনার পাশে লিখছে খাজনার অঙ্ক। বেশ নিরুপদ্রবে কাজ চলছিল।

কিন্তু কোথা থেকে এল ছোঁড়াটা। আর এসেই গোল বাধাল।

আবার যেন বাজ গরজে উঠল আকাশে।

: সিধু!

লাঠিয়াল সিধু। দলবল নিয়ে তৈরি ছিল। রাজার হুকুমের জন্য সে এক পায়ে খাড়া।

লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেল।

: খবরদার! ফুঁসে উঠল সাহাবুদ্দিন। কোমরে গোঁজা হাত খানেক লম্বা ধারালো ছোরা খানা তখন ওর হাতে। সকালের সোনা ঝরা রোদ ঝিকমিক করছে ছোরার ফলায়।

সিধু লাঠিয়ালও ডর পাওয়ার মানুষ নয়।

জোকার দিয়ে ছুটল দল বল নিয়ে....হা....রে.... রে....রে!

চোখের নিমেষে ঘটল অঘটন। এক বিশেষ কায়দায় ছোরার ফলাটা ডান হাতে ধরে দেহ দুমড়ে তাক্ করে সজোরে সেই ছোরাখানা ছুঁড়ল। আমূল বিঁধল ছোরাখানা সিধু লাঠিয়ালের বুকের ডান ধারে।

এই লাও খাজনা!

হাতের কাছে গাদা বন্দুক। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপলেন।

দুরন্ত আওয়াজ আর এক ঝলক আগুন।

সাহাবুদ্দিনের সাড়ে ছ'ফুট জোয়ান দেহটা লুটিয়ে পড়ল সুপুরি গাছের তলায়।

ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। এতক্ষণ আমি যেন রাজ-কাছারির সেদিনের দৃশ্য দেখছিলাম! অন্ধকার ঘরে এখন সব মিলিয়ে গেছে। আমার চোখে ঘুম গেছে টুটে।

এ কাহিনী শুনেছিলাম আমার ঠাকুমার মুখে। কিন্তু কাহিনীর এখানেই ইতি হয় নি।

আমাদের বংশের কাহিনী এটা। কেননা আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ। জবর-দস্ত আর ডাকাবুকো মানুষ। ভয় ওর কাছে ঘেঁষতে পারত না। সাহেবদের সঙ্গেও ছিল দারুণ খাতির। তাদের খানা পিনার আসরে ডাকতেন। বাদা জঙ্গলে বাঘ মারতে যেতেন গাদা বন্দুক হাতে।

সাহেবরা না কি বলত রাজা, রিয়্যালি তোম জঙ্গলের শের আছ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

সেদিন খুন করার পর রাজা লাঠিয়ালদের বলেছিলেন—যা। ছোঁড়াটার লাশ ওই কালিন্দীর চরে পুঁতে দিয়ে আয়।

কাহিনীর সেই শুরু।

পরের সনে আবার গেছেন মহালে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

পুণ্যাহ....নজরানা আর খাজনা আদায় করতে হবে প্রজাদের কাছ থেকে। তিনি বিশ্বাস করতেন, জমিদারি বাপের নয় তাপের। বেয়াড়া প্রজাকে খতম না করলে শেষে সব প্রজাই যে এক দিন খেপে উঠবে। তাদের মগজ যাবে বিগড়ে।

নজরানা আর খাজনার কাজ মিটল।

দুপুরে ঘোড়া চড়ে গাদা বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোলেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

খবর এসেছে মাইল দশেক দূরে একটা মানুষ খেকো বাঘ বড় জ্বালাতন করছে। কালিন্দী পেরিয়ে বাঘটা এপারে না কি এসে উঠেছে। বাঘ আর মানুষ বেয়াড়া হলে খতম তাকে করতেই হবে নইলে জমিদারি চালান যায় না।

পৌষ মাস। শীত নামার কথা জাঁকিয়ে।

কিন্তু সহসা সেদিন বিকেলে আকাশ ছেয়ে মেঘ জমল। ঝড় উঠল অসময়ে। বাদা বনের অশান্ত ঘূর্ণি ঝড়। সাগরের দিক থেকে হাহা রবে ছুটে আসছে ঝড়ের দামাল শিশুরা। কারা যেন দুরন্ত আকাশে ফুঁসছে। দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চায় মাটির বুকের সব কিছু। ঘরের চাল বাঁধন ছিঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যাচ্ছে দূরে। শিকড়ের বাঁধন কাটিয়ে ঝাঁকড়া গাছগুলো পড়ছে ছিটকে।

সারা রাত ধরে তাণ্ডব চলল ঘূর্ণি ঝড়ের।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ফিরতে পারলেন না কাছারি বাড়িতে এই ঝড়ের মধ্যে।

পরদিন গ্রামের লোকজন জঙ্গল থেকে তাঁর লাশ কুড়িয়ে আনল। ঘোড়াটা বেপাত্তা। গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে তাঁর মাথাটা চুরমার হয়ে গেছে। আর বুকের ডান ধারে এক গভীর ক্ষত চিহ্ন। কে যেন একখানা ধারালো ছোরা আমূল বসিয়ে দিয়েছে ওখানে।

পরের সনে নজরানা আর খাজনা আদায় করতে গেছেন আমার ঠাকুর্দার কাকা।

তিনিও সাহসী আর জবরদস্ত মানুষ। সবাই বলে ছোট রাজা।

কাছারী বাড়িতে বসে তিনি দেখতে পেলেন কালিন্দীর বুকে সদ্য জেগে ওঠা চরখানা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কষাড় জঙ্গল গজিয়েছে। চরের মাটি বড় উর্বরা। ঠিক মতন চাষ করাতে পারলে দুনো ফসল ফলবে।

তার মনে লোভ দেখা দিল।

চরের জমি তিনি খাসে রাখবেন। চাষ করাবেন লোক জন দিয়ে। প্রজা বিলি করবেন না। ওতে পুরো মুনাফা ওঠে না।

বিকালে লোকজন নিয়ে কালিন্দীর চর দেখতে গেলেন।

কাছিমের পিঠের মতন বিশাল চর। কষাড় জঙ্গল আর তার চার ধারে শীতের কালিন্দীর নিস্তরঙ্গ স্রোত।

সহসা সামনে বন দুলে উঠল। একটা ডোরা কাটা বিশাল জানোয়ার সামনে লাফিয়ে পড়লো।

ছোট রাজার হাতে গাদা বন্দুক।

সঙ্গের লাঠিয়ালদের হাতে লাঠি সড়কি বল্লম।

কিন্তু হাতিয়ার তোলার কেউ সময় পেল না।

ডোরা কাটা জানোয়ারটা ছোট রাজার টুঁটি কামড়ে ধরে আবার জঙ্গলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। নিমেষে মিলিয়ে গেল।

সারা রাত ধরে চরের জঙ্গল ঘিরে প্রজারা সেই ডোরা কাটা জানোয়ারটাকে খুঁজল। মশালের আগুনে রাতের আঁধার পালাল। কিন্তু ডোরা কাটা জানোয়ারের হদিস চরের জঙ্গলে মিলল না। সবাই অবাক। চরের জঙ্গলে ডোরা কাটা আস্তানা বানাল কবে? কই গ্রামের কেউ ত চরের জঙ্গলে ওর ডাক কোন দিন শোনে নি! আর গেলই বা কোথায়? এতগুলো মানুষের নজর এড়িয়ে কালিন্দীর জল পেরিয়ে পালাল কি করে?

পরের দিন ভোরে ছোট রাজার লাশ পাওয়া গেল একটা ঝোপের ধারে।

গোলপাতার ঝাড় এধারে ওধারে ছড়ানো।

(শেষাংশ ২৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

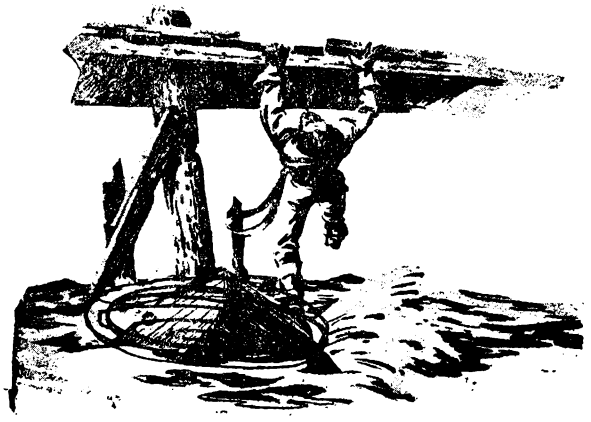

শুধু একটা অনুমিতি প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেই নিজের নৌকাডুবি ঘটিয়ে বসেছিলেন ফরাসী ডাক্তার

ঝিনুক নৌকোর নায়ক

অদ্রীশ বর্ধন

রবিনসন ক্রুশোর কপাল ভাল ছিল। জাহাজ ডুবি হওয়ার পর একটা মরু-দ্বীপ পেয়েছিলেন। ফলে, উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন হয় না হাজার হাজার সমুদ্র অভিযাত্রীদের ক্ষেত্রে। শান্তির সময়ে, অথবা যুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে ডুবন্ত জাহাজ থেকে লাইফবোটে চেপে যারা প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে, তারা হয় মারা গেছে তেষ্টায়, অথবা অনাহারে।

এদের দুরবস্থায় প্রাণ কেঁদে উঠেছিল এক ফরাসী ডাক্তারের। তাঁর নাম, অ্যালেন বোম্বার্ড। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এই অবস্থার একটা প্রতিকার করবেনই। উনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এই ধরনের অধিকাংশ মৃত্যুই ছিল অহেতুক। জল আর খাবার ছাড়াই লাইফবোট অকূল দরিয়ায় থাকুক না ভেসে দীর্ঘদিন, মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অক্কা পেতে যাবে কেন? অবশ্য এটা ঠিক যে মানবিক সহনশক্তির একটা সীমা আছে এ সব পরিস্থিতিতে। কিন্তু এই সীমা রেখার বাইরেও ক্ষুধা তৃষ্ণাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অসহায় মানুষটি কেবলমাত্র খোলা নৌকো আর নিজের উপস্থিত বুদ্ধিকে সম্বল করে বেঁচে থাকতে পারে দিনের পর দিন।

থিওরিটা অভিনব নিঃসন্দেহে। অনুমিতি সপ্রমাণ করার জন্যে তিনি যে পন্থার শরণ নিলেন, সেটি আরও অভিনব—কিন্তু যুগ যুগ ধরে কোনো বৈজ্ঞানিকের কাছেই তা অপরিজ্ঞাত নয়ঃ ডাক্তার বোম্বার্ড নিজেই একটা গিনিপিগ হয়ে গেলেন!

১৯৬৩ সালের ১৯ শে অক্টোবর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এমন একখানা রবার নৌকোয় ধূ ধূ আটলান্টিক পাড়ি দেবেন ঠিক করলেন যা অথই সমুদ্রের বুকে ঝিনুক-নৌকোর সমতুল্য। মোচার খোলাও বলা যায়! নৌকোটা দৈর্ঘ্যে মোটে ১৫ ফুট লম্বা। রওনা হলেন ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ থেকে! অনুমিতিটাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করার জন্যে সঙ্গে একদানা খাবার বা এক ফোঁটা জল পর্যন্ত রাখলেন না।

সবার ধারণা সমুদ্রের জল পান করেই নাকি জাহাজডুবি অসহায় মানুষগুলো উন্মাদ হয়ে যায়—মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। বোম্বার্ড তা একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। ওঁর অনুমিতি ছিল ঠিক উলটো। উনি বিশ্বাস করতের জাহাজ ডুবির পর

অসহায় মানুষগুলো অক্কা পায় সমুদ্রের জল পান করে না বলেই। বিষম ভুলটা দিনের পর দিন চালিয়ে যাওয়ার ফলে শরীর যখন জলশূন্য হয়ে পড়ে, তখন মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া ছাড়া অভ্যন্তর থাকে না।

তাই, যেদিন থেকে সমুদ্রে ভাসলেন বোম্বার্ড, সেই দিন থেকেই নিয়ম করে রোজ দেড় পাঁইট হিসেবে জল পান করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে খেয়েছেন আর একটা অদ্ভুত জিনিস। সেটাও জল তবে সমুদ্রের নয়। হারপুন দিয়ে মাছ গেঁথে নৌকোয় তুলে আনতেন। সেই মাছকে কষে নিংড়ে গা থেকে জল বার করতেন এবং সেই জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতেন!

স্কার্ভি রোগ সমুদ্রটা পথিকদের হামেশাই হত সেকালে। ভিটামিন সি-য়ের অভাবে প্রতিটি লোমকূপের ডগা দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। সে এক যন্ত্রণাময় চর্মরোগ। রোগটাকে ভয় পেতেন বোম্বার্ড। তাই হুঁশিয়ার ছিলেন গোড়া থেকেই। তাই বলে কি ওষুধ গিলতেন মুঠো মুঠো? মোটেই নয়। যা খেতেন, তাও একটা তাজ্জব বস্তু। সমুদ্রই ওষুধ যুগিয়ে গেছে তাকে। খুব মিহি জাল ফেলে প্লাঙ্কটন ছেঁকে তুলতেন। প্লাঙ্কটন জিনিসটা হল সমুদ্রে ভাসমান জীববসতি। তার মধ্যে থাকে ক্ষুদে ক্ষুদে বর্মদেহী জীব ক্রাসটেসিয়ান, প্রোটোজোয়া, বিবিধ সামুদ্রিক প্রাণীর বাচ্চা আর ডিম; সেই সঙ্গে অনেকরকমের আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ—যেমন, ডায়াটম এবং বিবিধ অ্যালগি। ডাক্তার বোম্বার্ড রোজ দু-এক চামচ প্লাঙ্কটন আহার করতেন। ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদেহ থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন স্বদেহে চালান করতেন। তাপসিক আহার সত্ত্বেও তাই তিনি স্কার্ভিকে কলা দেখাতে পেরেছিলেন।

কিন্তু পথে বেরোলে বিপদ-আপদ তো থাকবেই। না থাকলে কি আর দুর্গমের অভিযাত্রী হতে পারতেন বোম্বার্ড? অভিযানের গোড়াতেই ঝড়ের পাল্লায় পড়ে ভগ্নপ্রায় হ'ল তার ক্ষুদে নৌকো। ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল পাল। বাড়তি পালটা ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়ে গেল ঝড়ে। কি আর করেন। ছুঁচ সুতো সঙ্গেই ছিল। সেলাই করে নিলেন ফর্দাফাঁই পালকে।

একে এই সামান্য আহার। তার ওপর একনাগাড়ে বৃষ্টির জল ভেজা। পরিণাম যা হবার তা হ'ল। দিন পনেরো পরেই গা-হাত-পা জ্বলে যেতে লাগল তীব্র প্রদাহে। সে কী যন্ত্রণা!

লোমহর্ষক

সবচেয়ে লোমহর্ষক অভিজ্ঞতাটা হল এই ঝড়ের পাল্লায় পড়ার পরেই। নৌকোয় আরামের একটা ব্যবস্থাই সঙ্গে এনেছিলেন তিনি—একটা হাওয়া-বালিশ। ঝড়ে বালিশটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল সমুদ্রে। ডানপিটে বোম্বার্ডও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিলেন জলে, বালিশ উদ্ধারের অভিলাষে। নৌকোর গতি মন্দীভূত করে রেখেছিলেন অভিনব একটি 'ব্রেক'-এর দৌলতে। একটা প্যারাচুটের মত ক্যানভাস হাওয়ায় ফুলে থাকত নৌকোর একদিকে – সেই হল তাঁর ব্রেক। জলে ঝাঁপ দিয়েই আতংকে হিম হয়ে গেলেন যখন দেখলেন, নোঙরের দড়ি এই প্যারাচুটের সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে যাওয়ায় ব্রেক ফেল করেছে—নৌকা ঝড়ের বেগে হু-হু করে ভেসে যাচ্ছে!

সেই দিনই নির্ঘাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন বোম্বার্ড। কিন্তু রাখে হরি মারে কে? দুঃসাহসীদের সহায়

হয় ভাগ্য! তাই আচম্বিতে দড়ির ফাঁসমুক্ত হয়ে ফুলে উঠল প্যারাচুট—ধরে গেল ব্রেক! হাঁচড়পাঁচড় করে নৌকোয় উঠে এলেন বোম্বার্ড।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী হতাশা এল অভিযানের তিপান্নতম দিবসে। কতদূর এসেছেন এবং ডাঙা আর ক'মাইল জানবার জন্য পাশ দিয়ে যাওয়া একটা জাহাজকে হাঁকডাক করে ডেকে এনেছিলেন। যখন শুনলেন আরও ছ-শ মাইল তাকে যেতে হবে এইভাবে—এই ঝিনুকসম নৌকো নিয়ে—তখন নিঃসীম নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লেন বোম্বার্ড।

মন ভেঙে গেলে যা হয়, বোম্বার্ডও তাই মনস্থ করলেন—অভিযান শিকেয় তুলে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাক। জল আর খাবার না থাকলেও সমুদ্র-বিহারে যে টিকে থাকা যায়, এই এক্সপেরিমেণ্ট তো সফল হয়েছে! ব্যস, তবে আর কেন সাধের শরীরটাকে কষ্ট দেওয়া।

কিন্তু ভাঙা মন ফের জোড়া লেগে গেল জাহাজে উঠে ভরপেট একটা খানা খাওয়ার পর। ফিরে এল আগের উৎসাহ। ঠিক করলেন, পাগল নাকি, এতদূর এসে শেষ দেখে যাবেন না? যা থাকে কপালে, এই ছ-শ মাইল মেরে দেবেন নিজের নৌকায়।

ফলে ইতিহাস রচনা করে গেলেন দুঃসাহসী মানবহিতৈষী ডাক্তার বোম্বার্ড। খামোকো নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রমাণ করে গেলেন জল আর খাবার না থাকলেও জাহাজডুবির পর অসহায় মানুষগুলো দিব্বি বেঁচে থাকতে পারে সমুদ্রের আহার আর পানীয়-র কল্যাণে।

৬৫ দিন পর ২৭৫০ মাইল পথ পেরিয়ে ক্রিস্টম্যাস ঈভে বারবাডোস্ পৌঁছেছিলেন তিনি। ওজন যদিও কমে গিয়েছিল পাক্কা ৫৬ পাউণ্ড, কিন্তু বেঁচেছিলেন বহাল তবিয়তে। ওঁর যে বিশ্বাস হাতেনাতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা তা তো করেছেন—ওজন কমল তো বয়ে গেল!

(২২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সিধু লাঠিয়ালের সাকরেদরা ঠিক জায়গাটা চিনতে পারল।

এখানেই পলিমাটির নরম কাদায় ওরা সেদিন সাহাবুদ্দিনের লাশটা পুঁতে রেখে গিয়েছিল।

কি আশ্চর্য....ডোরা কাটার কবলে পড়েছিল ছোট রাজা....কিন্তু কই ওর ঘাড়ে ত দাঁতের ক্ষত চিহ্ন নেই! শুধু গলা টিপে ধরে কে যেন খুন করে রেখে গেছে ছোট রাজাকে। আতঙ্কে তার জিভ আধ হাত বেরিয়ে এসেছে। বুকের ডান ধারে সেই ভয়ঙ্কর আঘাত চিহ্ন। যেন ধারালো একখানা ছোরা আমূল আঘাত হেনেছে।

সাহাবুদ্দিনের অশরীরী আত্মা আজও বুঝি কালিন্দীর চরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাদা জঙ্গলের জমিদারি আমাদের বংশের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু এক বিদেহী আত্মার প্রতিশোধ গ্রহণের আওতা থেকে আমরা মুক্তি পাই নি!

ফিংগার প্রিণ্ট

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

সারাদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাইরে যাবার উপায় ছিল না। গোয়েন্দা অশোক রায় ঘরে বসে ইংরেজী অপরাধ বিজ্ঞানের বই পড়ছিল। অশোকের বন্ধু মলয় পাশের চেয়ারে বসে একটা পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল।

মলয় বলল—রাতে সাধারণতঃ ক্রাইম বাড়ে কেন?

অশোক বলল অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া সোজা। তাছাড়া রাতে কর্মচঞ্চল মানুষের স্নায়ু উত্তেজিত থাকে। পৃথিবীর গ্রেট ক্রাইমগুলো কিন্তু শেষ রাতেই হয়েছে বেশি।

অশোক আবার বই পড়তে শুরু করল। আজ আলিপুর থেকে ফিরে এসে অশোক একটার পর একটা অপরাধতত্ত্বের বই পড়ে যাচ্ছে। এত রহস্যের কিনারা করেছে গোয়েন্দা অশোক রায় কিন্তু বর্তমান কেসটার কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছে না।

ঘটনাটা এই ঃ একজন আততায়ী পর পর তিনটে খুন করেছে। পুলিশ তাকে ধরতে পারছে না। যারা খুন হয়েছে তারা কেউই খুন হবার মত লোক নয়। তাদের মেরে কারো কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। তিনটে খুনই গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। ফিংগার প্রিণ্ট নেওয়া হয়েছে। তিন জায়গায় একই রকম ফিংগার প্রিণ্ট এসেছে। অর্থাৎ আততায়ী একজন লোক। একজন পানের দোকানের দোকানী, দ্বিতীয় জন একজন দর্জি এবং তৃতীয় জন একজন মারোয়াড়ী যুবক।

প্রথম এবং দ্বিতীয়জন মেটিয়া বুরুজের অধিবাসী,

তৃতীয় জন বড়বাজারে থাকত। সকলেই বাড়িতেই খুন হয়েছে।

মলয় বলল মারোয়াড়ী যুবকের হত্যার পেছনে টাকা পয়সার ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু পানওয়ালা এবং দর্জি হত্যার পেছনে কী মোটিভ থাকতে পারে ?

অশোক বলল—এ মারোয়াড়ী যুবকের টাকা পয়সা নেই। একরকম বাপে-খেদানো ছেলে। বাবা শুধু বাড়িতে তাকে দয়া করে থাকতে দিয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা শুনবে ? যে লোকটি এই তিনটে প্রাণীকে জগৎ থেকে সরিয়ে দিল—সে অনেকদিন আগেই মারা গেছে !

—হোয়াট ! মলয় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মরা মানুষ খুন করেছে ? হতেই পারে না ! ভৌতিক খুন নাকি ?

—সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। অন্ততঃ আলিপুরের পুলিস রিপোর্ট সেই রকম।

মলয় বলল—মাথাটা কিরকম গোলমাল ঠেকছে। অশোক ঠিক করে বল।

—যার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে—সরকারী দলিলে তাকে তিন বছর হল মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত এক দাগী খুনী আসামীর সঙ্গে এই কেসের ফিংগার প্রিন্টগুলো মিলে যাচ্ছে। ফিংগার প্রিন্ট তো দুজন লোকের এক হতে পারে না, যমজ ভাইদেরও না। গত শতকের বাংলাদেশের পুলিস কমিশনার হার্শেলসাহেব প্রথম এটা আবিষ্কার করেন। এটা সেই হার্শেলের লেখা বই।

তিনটে খুনের মধ্যে দুটো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। পরের দিন। কিন্তু তৃতীয় খুনটা এক সপ্তাহ পরে।

—এটা দেরি হল কেন ? তাকে ধরতে পারেনি ?

—তাও হতে পারে আবার অন্য কারণও থাকতে পারে।

যদিও অশোক খুনের জায়গাগুলো দেখে এসেছিল, মলয়কে সাথে করে আবার সরেজমিনে তদন্ত করতে গেল।

মেটিয়াবুরুজ এমন একটা একটা জায়গা যেখানে পৃথিবীর সব দেশের লোক কিছু না কিছু আছে। কত ফিকিরে কত মানুষ যে এখানে পয়সা কামাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

অশোক প্রথম গেল পানের দোকানে। দোকানটা বন্ধ। দোকানীর নাম সনাতন। সামনের একটা বস্তিতে থাকত। বস্তিটা একটা চিড়িয়াখানা। যত দাগী আসামী, ছিঁচকে চোরের আস্তানা এখানে। কাকে সন্দেহ করবে ?

সকলকেই তো সন্দেহ করা যায়।

অশোক পাশের লোকের এজাহার নিল।

অশোক বলল—সনাতন-এর মৃতদেহ কে প্রথম দেখতে পায় ?

লোকটি বলল—তা বলতে পারব না। চব্বিশ জাতের বাস এখানে। খুন খারাপি লেগেই আছে ! পুলিস আসে। দুদিন চুপচাপ থাকে আবার যে কে সেই।

অশোক—সনাতনের পাশের ঘরে কে থাকে।

—ওরই এক বন্ধু। নাম সতীশ। কী কাজ করে জানি না। এখানে স্থায়ীভাবে কেউ থাকে না। কে কোথায় কোন্ ধান্দায় ঘুরছে বলা মুস্কিল।

অশোক—ও পাশটা কারা থাকে ?

—দুটো অবাঙালী পরিবার।

নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করেও অশোক সনাতনের সঠিক খবর পেল না। তেমনি রহস্য থেকে গেল সতীশ। তবে সনাতনের সঙ্গে সতীশের যে কোন

তিক্ততা ছিল না তা বোঝা গেল।

সনাতনের পানের দোকান থেকে অশোক দর্জির দোকানে গেল। সামান্য দূর। দোকান বন্ধ। দোকানের সামনে পুলিস মোতায়েন ছিল। ইতিমধ্যে মেটিয়াবুরুজ থানার ও. সি. সনৎ মিত্রও এসে গেছে। অশোক তদন্তের ভার নিয়েছে জেনে সে নিশ্চিন্ত হল।

দর্জির নাম মমতাজ আলি। ও. সি. সনৎ মিত্র দোকানের দরজা খুলে দিল। অশোক ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল একরাশ নীল কাপড় ভাঁজ করা রয়েছে।

ইতিমধ্যে এ অঞ্চলের মোড়ল শাজাহান এসে হাজির হয়েছে।

সনৎ মিত্র শাজাহানের সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—শাজাহানের কাছে এ অঞ্চলের লোকেদের সব খবর পাবেন।

অশোক বলল—মমতাজ কি শুধু নীল কাপড়ই শেলাই করত?

শাজাহান—আজ্ঞে, বিদেশী জাহাজের খালাসীরা নীলজামাই পছন্দ করে বেশি।

কাপড়ের ডাঁই সরিয়ে অশোক দেখতে পেল পানের আনুষঙ্গিক কিমামের ছোট ছোট কৌটো।

দু' একটা শুঁকে অশোক বলল—সনাতনের সঙ্গে মমতাজের সম্বন্ধ কেমন ছিল?

শাজাহান—এক পাড়ায় বাস; দুজনের ব্যবসাও বহুদিনের, তাই বন্ধুত্বও ছিল অনেক দিনের।

ইতিমধ্যে অশোক একটা অর্ধ সমাপ্ত নীলজামা উলটে বলল—দেখ মলয়, ভেতরের পকেটা কী অদ্ভুতভাবে বানানো হয়েছে।

পকেটের ভেতরে কিমামের কৌটোর সাইজের আরেকটা পকেট। সকলেই আশ্চর্য হয়ে পকেটটা দেখতে লাগল।

অশোক বলল—আচ্ছা শাজাহান, সনাতন লোকটা কেমন ছিল?

শাজাহান—খারাপ ছিল না। তবে আজকাল একজন মারোয়াড়ী ছোকরার সাথে মেলামেশাটা বেশি করত।

—সতীশ লোকটা কেমন?

—সতীশকে বোঝা বড় মুস্কিল। মাসের অর্ধেক দিনই জেলে থাকে। জাহাজের জিনিস স্মাগলিং করে। তবে পুলিস ওর চুরি প্রমাণ করতে পারে নি। ওর খবর সনাতনই জানত। পাশাপাশি ঘর। বন্ধুত্বও অনেকদিনের।

—এ অঞ্চলে জাহাজী খালাসীদের কেমন আনাগোনা?

—সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকুন, স্বচোখেই দেখবেন। পৃথিবীর সবদেশের খালাসীদের দেখতে পাবেন।

মেটিয়াবুরুজ ছাড়ার আগে অশোক সনৎ মিত্রকে বলল—সতীশ বর্তমানে কোন জেলে আছে জানাবেন। ওর বিশদ বিবরণ জানাবেন। আর তিনটে কেসেরই আততায়ীর ফিংগার প্রিন্ট আমাকে আজ রাত্রে পাঠিয়ে দেবেন।

মারোয়াড়ী যুবকের নাম রতনলাল। অশোক আর মলয় রতনলালের বাড়ি যেতেই ওর বাবা কেঁদে ভাসিয়ে দিল।

অশোক বলল—রতনলাল বাড়ি ফিরত কখন?

রতনলালের বাবা বলল—কিছুই ঠিক ছিল না। একেবারে বাজে ছেলে হয়ে গেছল। ব্যবসাতে মন ওর কোনদিন ছিল না। গদিতে বসে ব্যবসারও মেজাজ ছিল না। এ জন্য ওর মায়ের সাথে রাতদিন ঝগড়া হত। আবার মেজাজ ভাল থাকলে মাকে বলত—তোমাকে তিনজোড়া সোনার

জুতা বানিয়ে দেব। শুধু কদিন অপেক্ষা কর।

অশোক আর মলয় রতনলালের ঘরে গেল।

ঘরে তেমন কিছুই নেই। ঘরের টেবিলে কয়েকটা ইংরেজী বিজ্ঞানের পত্রিকা ছড়ানো রয়েছিল।

অশোক রতনলালের বাবাকে জিজ্ঞেস করল—আপনার ছেলে কী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে?

—আজ্ঞে বি. এস-সি পাস করেছিল।

—ওকে যে একজন লোক খুন করে গেল, আপনারা কিছু টের পেলেন না?

—রতন রাস্তার ধারে একটা ঘরে থাকত। রাত বেরাতে আসত বলে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

অশোক পত্রিকাগুলো ভাল করে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল—

—ভারতবর্ষে কোথায় ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় জান?

মলয় বলল—বিহারে।

—এটা কি কাজে লাগে?

—এর চাহিদাই তো এখন সব চেয়ে বেশি। পারমাণবিক বিস্ফোরক তৈরি করতে এই ধাতু অপরিহার্য।

কিছুক্ষণ পরে অশোক একটা কিমামের কৌটা রতনলালের শেলফ থেকে নিয়ে এসে খুলে ফেলল। একটা কাল ধাতব পদার্থ কৌটোয় রয়েছে।

অশোক বলল—এই হল সেই ইউরেনিয়াম। মাডাম কুরী আবিষ্কৃত রেডিয়ামের মাসতুতো ভাই। এই ইউরেনিয়াম বিহারে আকরিক খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়, গবেষণাগারে শোধন করা হয়। শোধন করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার।

কদিন অশোকের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কী করছে একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

কিছুদিন পর অশোকের আহ্বানে মলয়কে আলিপুর পুলিস কোর্টে যেতে হল। লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের স্থান নেই। একপাশে সতীশ একটা টুলে বসে আছে; তার হাতে হাত-কড়া।

অশোক তার কাহিনী আরম্ভ করল—এ ধরনের খুন আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত হয় নি বলেই আমার ধারণা। খুনী প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। অতি লোভই তার বিপর্যয়ের কারণ।

সতীশ একজন দাগী আসামী। জাহাজের চোরাই মাল বাঁকা পথে বিক্রি করাই তার কাজ ছিল। সে বেশির ভাগ সময় জেলে থাকত বলে সনাতনের কাছেই সব জিনিস গচ্ছিত রাখত। জাহাজের খালাসীদেরও সে এ দেশের অনেক মূল্যবান জিনিস বিক্রি করেছে।

ইতিমধ্যে রতনলাল দৃশ্যপটে এসে গেল। স বিভিন্ন জায়গা থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে খালাসীদের মারফত বিদেশে চালান দিত। মেটিয়া-বুরুজে গিয়ে সে সনাতনকে হাত করল। সনাতনের পানের দোকানে খালাসীদের আনাগোনা সব সময় লেগেই থাকতো। কাজেই এ কাজে সনাতনই যে উপযুক্ত লোক—রতনলালের কোন সন্দেহই রইল না।

কিন্তু কীভাবে ইউরেনিয়াম পাচার করবে!

সনাতন মমতাজ আলি দর্জিকে ঠিক করে দিল। কিমামের কৌটোয় ইউরেনিয়াম ভরে জামার ভেতরের পকেটে এমন সুন্দর ভাবে সেলাই করে দিল—বাইরে থেকে বোঝবার উপায় থাকত না। খালাসীরা নীল জামা পছন্দ করে—রতনলাল কয়েক থান নেভি ব্লু কাপড় কিনে মমতাজ আলিকে দিয়ে এল।

রতনলাল করিৎকর্মা ছেলে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের সাথে আঁতাত করে ফেলেছে। খালাসীরা যাতে স্মাগলারদের হাতে ইউরেনিয়ামের কৌটো পৌঁছে দেয় তার ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছে।

সমস্ত খবরাখবরের জন্য সনাতনকে নিযুক্ত করে রেখেছে। সনাতন বিশ্বস্ততার সঙ্গে রতনলালের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই একটু বেশি রাতে রতনলাল মেটিয়াবুরুজে গিয়ে সনাতন এবং মমতাজ আলির সঙ্গে দেখা করে আসত।

কিন্তু মুস্কিল বাধালো সতীশ। সে জেল থেকে ফিরে এসে এবার সনাতনের সঙ্গে পুরানো বন্ধুত্ব যাচাই করতে গিয়ে দেখল যে সনাতন অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে। তাকে কোনরকম পাত্তাই দিচ্ছে না।

সতীশের কেমন যেন খটকা লাগল।

সে কয়েকদিন সনাতনের গতিবিধি লক্ষ্য করল। রতনলালের আগমন ভাল করে পরীক্ষা করে নিল। মমতাজ আলির দোকানেও কয়েকবার হানা দিল।

এ অঞ্চলে সেই বাদশা ছিল ; রতনলালের সাম্রাজ্য বিস্তার তার ঈর্ষার কারণ হল।

কয়েক দিনের মধ্যেই সে তিনটি প্রাণীকে ইহজগৎ থেকে বিদায় দিল। কিন্তু সতীশ কীভাবে খুন করেছিল—সেটাই হল আসল রহস্য।

একজন দাগী আসামী অনেকদিন আলিপুর জেলে ছিল। তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায়। জেলেই সে মারা যায়। আসামীটির কোন ওয়ারিশ না থাকায়—ওর অতি দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে মৃতদেহ দিয়ে দেওয়া হয়। দাহ করবার নাম করে সতীশ সেই মৃতদেহটিকে সংগ্রহ করে। তার হাত দুটো কেটে নিয়ে ভেতরের মাংস বের করে চামড়াটা ট্যান করে কেটে নিয়ে একজোড়া দস্তানা করে নিয়েছিল। সেই দস্তানা পরেই সে খুন করেছিল। সনাতন এবং মমতাজ আলিকে খুন করতে সতীশের কোন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু রতনলালকে খুন করতে গিয়ে সে কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যায়। রতনলাল যুবক ; তার উপর তার পকেটে সব সময় ছুরি থাকত। সতীশ রতনলালের গলা টিপতে যাবার সময় রতনলাল ছুরি চালাল। আর তাতেই সতীশের দস্তানাটার অনেকটা কেটে গেল। তাই রতনলালের গলায় দু'রকম ফিংগার প্রিন্ট এসেছে।

আমি সতীশের হাতে ব্যাণ্ডেজ দেখেই ওকে সনাক্ত করি এবং সন্ধান নিয়ে যখন জানলাম যে কোন জেলেই সে নেই তখন বুঝলাম একবার সে ডেরায় ফিরবে। তাই জাল পেতে ওকে ধরতে কোন অসুবিধে হয় নি। রতনলাল ছুরি না চালালে ওকে ধরা অসম্ভব ছিল।

আমাকে সহযোগিতা করবার জন্য পুলিসকর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সতীশ মাথানীচু করে টুলের উপর বসে ছিল—অপমানে না অনুশোচনায় ?

———

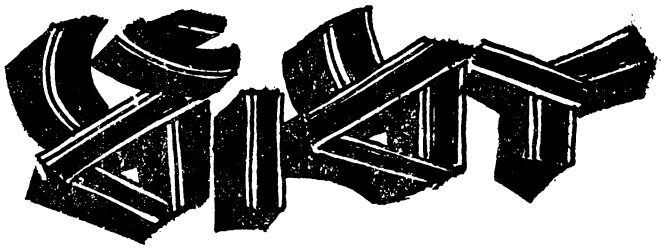

বুদ্ধির্যস্য

১। একটা ডিম সিদ্ধ করতে ৩½ সাড়ে তিন মিনিট সময় লাগে। সাতটা (৭) ডিম সিদ্ধ করতে কত সময় দরকার ?

২। রঘু আর ধনিয়া কয়লার দোকানে কাজ করে। বস্তা করে বাড়ি বাড়ি কয়লা পৌঁছে দেওয়া তাদের কাজ।

গত সপ্তাহে জনার্দন লেনে দুজনকে দেখলাম। রঘুর মাথায় এক বস্তা কয়লা। ধনিয়ার মাথায় তিনটে বস্তা। বস্তাগুলি সবই রঘুর বস্তার সাইজের ! কিন্তু মনে হল, রঘুর বস্তাটা যেন অনেক ভারী। কি করে এটা সম্ভব বুঝলাম না। বলে দিতে পারবে ?

৩। একটা বছরে কতগুলি সেকেণ্ড আছে, বলতে পার ?

৪। যতই নেবে ততই বাড়বে, কমবে না !

ছুটির দিন। দুপুরের খাওয়াটা গুরুভোজন হয়ে গেছে। সুকুমার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে একটু দিবানিদ্রার সাধনা করছে। মুখের ওপর খবরের কাগজটা চাপা দেওয়া আছে।

সুকুমারের ছোট মেয়ে চম্পা ছুটে এলো—বাপি ! উঠে বসতে হল সুকুমারকে। জিজ্ঞাসা করে কি হল ?

—মুখের ওপর খবরের কাগজ চাপা দিয়েছ কেন বাপি ?

—রোদের ঝাঁজটা মুখে এসে পড়বে না বলে।

—আচ্ছা বাপি....

সুকুমার গম্ভীর গলায় বলে—আবার কি ? সারা সকাল একটার পর একটা প্রশ্ন করেছো !

—তুমি তো সবই জানো তাই !

মেয়ের কাছে এতো বড় সার্টিফিকেট পেয়ে সুকুমার মনে মনে খুশীই হল। খোস মেজাজে বলে—তা বলতে পার। তবে দেখছইতো আমি এখন বিশ্রাম করছি ! ক্ষিদে পেয়েছে ? যাও, মাকে বল, তোমাকে আরও খানিকটা পুডিং দেবে, ফ্রিজ থেকে ?

—আর একটুও তো নেই !

—সবটা খেয়ে ফেলেছ ? বুঝে সুঝে খাবে তো ? জানইতো, যত বেশী নিয়ে নেবে, পরিমাণে ততই কমে যাবে !

—শুধু পুডিং, কেক—এই সবের কথা বলছো ?

—তা কেন হবে। আমি সব জিনিসের কথাই বলছি। যতই নেবে, ততই কমবে। —এবার যাও, একটু ঘুমাওগে !

চম্পা গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর—

—বাপি ?

—আবার কি হল ?

(শেষাংশ ২৪২ পৃষ্ঠায়)

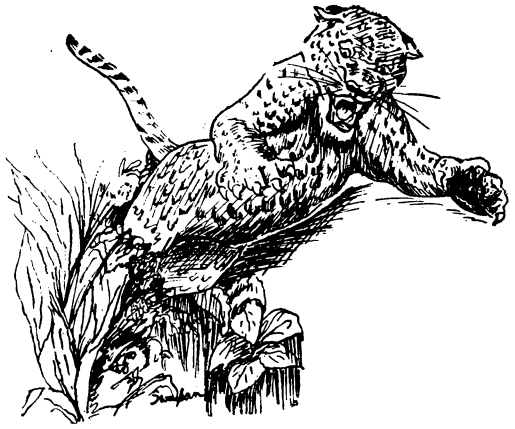

করবেট তার নাম দিয়েছিলেন 'রাজকুমার'

'রাজকুমারের' পূর্ব ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। পাহাড়তলির এক গভীর খাদে তার জন্ম হয়েছিল। তার পরিবারে ছিল সর্বসাকুল্যে তিন জন—বাবা, মা ও ছেলে।

এক বছরের বাঘের বাচ্ছারা সাধারণতঃ মায়ের কাছ ছাড়া হয় না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে করবেট বুঝলেন, 'রাজকুমার' একেবারেই নিঃসঙ্গ! আন্দাজ করলেন, 'রাজ-কুমারে'র মা নিশ্চয়ই বাচ্ছাকে ছেড়ে সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়েছে।

জানুআরি মাসের মাঝামাঝি করবেট সব প্রথম চাক্ষুষ 'রাজকুমার'কে দেখলেন—এতদিন শুধু পায়ের ছাপই লক্ষ্য করে এসেছেন। সন্ধ্যেবেলা এমনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন করবেট। দেখলেন একটা কাক হঠাৎ মাটি থেকে উঠে একটা গাছের ডালে বসে ঠোঁট মুছতে লাগলো। জঙ্গলের মধ্যে পাখিদের এধরনের আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঘের শিকারের হদিশ দেয়। কাকটা যেখান থেকে উড়ে এসেছিল সেই দিকে এগিয়ে গেলেন করবেট। অনুমান মিথ্যা নয়—দেখলেন একটা মরা চিতলের দেহাবশিষ্ট।

'রাজকুমার' চিতলটাকে আগের দিন রাত্রে মেরেছে—খানিকটা খেয়ে ছিল। তারপর অবশিষ্ট ফেলে রেখে সে চলে যায়। পরে এসে আবার খাবে—এটাই বাঘেদের স্বভাব!

বেচারা রাজকুমার! অবশিষ্ট মাংস খাওয়া তার ভাগ্যে ঘটেনি। বোধ হয় পথ-চলিত একদল লোক সেই পথ দিয়ে যাবার সময়—বাঘে খাওয়া চিতলের বাকি মাংস কেটে নিয়ে যায়। পড়ে থাকে কয়েক টুকরো হাড় আর খানিকটা জমাট বাঁধা রক্ত। কাকটা এই রক্ত খেতেই এসেছিল।

কুলগাছের ডালে বসে করবেট দেখলেন, একটা বুড়ো শুয়োর স্থানটির কাছাকাছি এসে হাওয়ায় গন্ধ শুঁকলো—তারপর এগিয়ে এলো। খাবার মতন কিছু নেই দেখে সে লাফাতে লাফাতে চোখের আড়ালে চলে গেল।

সূর্যদেব তখন পাটে বসেছে। সামনে ডান দিকের ঝোপটা নড়ে উঠলো। করবেট দেখলেন তিরিশ

গজ দূরে জঙ্গলের ওদিকে খোলা জায়গাটা পার হয়ে একটা জন্তু বেরিয়ে এলো। একটু পরেই করবেটের সামনের ঝোপটা ফাঁক হল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বাঘের বাচ্চা—'রাজকুমার'।

মরা চিতলটার খোঁজে এগিয়ে এসে রাজকুমার দেখলো তার সাধের শিকারের অবশিষ্ট কিছু নেই। 'রাজকুমার' এতোদিন বনে জন্তু জানোয়ারদের—তার আহারের শিকারদেরই সাক্ষাৎ পেয়েছে। সে তখনও জানেনা যে তার সবচেয়ে বড় শত্রু হল মানুষ। ঐ জঙ্গলে করবেট ছাড়া আরও অনেকে বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করে। সুতরাং রাজকুমারকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হলে, তাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার, সমঝে দেওয়া প্রয়োজন যে অসতর্ক ভাবে শিকারের কাছে এগোনো আদৌ নিরাপদ নয়।

খুঁটির গায়ে লেগে থাকা মাংসের গন্ধ শুকবার জন্যে 'রাজকুমার' অসতর্ক ভাবে মাথা উঁচু করতেই করবেটের রাইফেলের গুলি রাজকুমারের নাকের ইঞ্চি খানেক ওপরে শক্ত কাঠের ওপর গিয়ে লাগলো। এই অভিজ্ঞতা বাচ্ছাটা ভবিষ্যতে একবার মাত্র বিস্মৃত হয়েছিল এবং তার খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল।

বছর দুই রাজকুমার ছিলনা ওখানে, সঙ্গিনী খুঁজতে বেরিয়েছিল।

একদিন ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে পাহাড়তলিতে শিকার করে ফেরার পথে করবেটের চোখে পড়লো একটা শকুন শালগাছের একটা মরা ডালে বসে আছে।

শকুনের উপস্থিতি ইঙ্গিতবহ—নিশ্চয়ই কাছে পিটে কোথায় মরা জন্তু জানোয়ার আছে। শকুনটা করবেটের দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। সামনে খানিকটা ঝোপ। তারপর গভীর জঙ্গল। হালকা পায়ে করবেট গাছটার দিকে এগিয়ে গেলেন, চার দিকে উঁকি মেরে দেখলেন। একটা শম্বরের একদিকের শিং নীচু ঝোপের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। শম্বরটা মৃত না হ'লে ওভাবে পড়ে থাকতো না। পায়ে রবারসোলের জুতো। নিঃশব্দে একটা শেওলা ঢাকা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াতেই শম্বরটা পুরোপুরি নজরে পড়লো। পিছনের অংশটা খাওয়া হয়ে গেছে, দুদিকে বাঘ ও বাঘিনী। দুটো বাঘই ঘুমোচ্ছিল। সামনের দিকে সোজা দশফুট অথবা বাঁদিকে তিরিশ ফুট যেতে পারলে, বাঘটার ঘাড়ে গুলি করবার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে করবেট এগিয়ে চললেন।

মৃত জানোয়ারের মাংস খাবার লোভে গাছের মরা ডালে বসে-থাকা শকুনের কথা করবেটের মনে ছিল না। করবেট এগিয়ে আসতেই শকুনের নজরে পড়লেন। এতো কাছে তাঁকে দেখে শকুনটা ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওপরের ডাল থেকে একটা সরু লতা ঝুলছিল, খেয়াল করে নি। তার ডানাটা লতায় ধাক্কা খেতেই শকুনটা ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল। চোখের পলক না পড়তেই বাঘিনীটা একলাফে শম্বর ও তার সঙ্গীকে ডিঙিয়ে পার হয়ে গেল। বাঘটাও নিমেষে উধাও হয়ে গেল। এর কিছুদিন পর থেকেই বাঘটা আবার সঙ্গিনীবিহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এতোদিন পর্যন্ত রাজকুমার চিতল, শম্বর মেরেই আহার যোগাড় করে এসেছে। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে সে তার জীবনে সর্ব প্রথম একটা বড় মোষ শিকার করলো। একদিন সন্ধ্যায় পাহাড়তলির কাছে পৌঁছে করবেট একটা মোষের

আর্ত চিৎকার এবং বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলেন। দুশো গজ দূরে একটা নালা থেকে গর্জনটা আসছে। পথ খুব খারাপ। নালাটা দেখা যায় এমন একটা উঁচু জায়গায় উঠে করবেট দেখলেন মোষটা মারা গেছে, তার লাশটা পড়ে আছে। কিন্তু বাঘের কোনও পাত্তা নেই।

পরদিন ভোরবেলা করবেট সেই জায়গায় ফিরে এলেন। সেই চূড়োয় উঠে দেখলেন, মরা মোষটা তেমনই পড়ে আছে। নরম জমি তার খুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। মোষটা প্রাণপণে লড়েছে। তার একটা পা জখম হবার পর বাঘটা মোষটাকে কাবু করে। নালা পার হয়ে বাঘের পায়ের দাগ এগিয়ে গেছে। কিছু দূরে একটা পাথরের ওপর রক্তের দাগ, একশো গজ দূরে একটা গাছের গায়ে আবার রক্তের দাগ দেখলেন করবেট। বুঝলেন, মোষের শিং-এর আঘাতে বাঘটা ভালোরকম জখম হয়েছে। তাই মরা মোষটার ওপর তার এমন বিতৃষ্ণা জন্মে যায় যে সে তার শিকারের কাছে ফিরে আসেনি।

তিন বছর পরে 'রাজকুমার' তার বাচ্চা বয়সের অভিজ্ঞতা—অসতর্কভাবে শিকারের কাছে না আসা—ভুলে গিয়ে খেসারত দেয়। এক জমিদার ও তার কয়েকজন প্রজা বাঘ মারার জন্যে বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছিলেন। গুলিটা রাজকুমারের কাঁধে লেগে হাড় ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সেই জমিদার বা তাঁর সঙ্গীরা আহত বাঘটাকে খুঁজে বের করবার কোনও চেষ্টা করেননি। ছত্রিশ ঘণ্টা পরে কাঁধের ঘায়ে একরাশ মাছি নিয়ে বাঘটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইন্সপেকশন বাংলো, সাঁকো পেরিয়ে একটা খালি গুদামে আশ্রয় নেয়। জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গ্রামের লোকেরা দলে দলে বাঘ দেখতে আসায় বোধ হয় ভয় পেয়েই 'রাজকুমার' গুদামের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে গ্রামের নীচের দিকে চলে যায়।

দু'মাস পরে দেখা গেল বাঘটা গ্রামের বাইরে বাছুর, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি ছোট খাটো জন্তু যা পাচ্ছে তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে। গুলি খাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে 'রাজকুমার' কোনও জানোয়ারকেই একবারের বেশী খেত না। ফলে তার আহারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যা দরকার তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশী জন্তু জানোয়ার সে শিকার করতে লাগলো! অদৃষ্টের পরিহাস! যে জমিদার রাজকুমারকে জখম করেছিলেন, তাঁর প্রায় চারশো গরু মোষ ছিল। স্বভাবতঃই তাঁরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হল।

বছর খানেকের মধ্যে 'রাজকুমার' আকারে যেমন বাড়লো, তার কু-খ্যাতিও তেমনই ছড়িয়ে পড়লো। নামজাদা শিকারীরা এবং আরও অনেকে তাকে মারবার জন্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

নভেম্বর মাসে একদিন সন্ধ্যাবেলায় জনৈক গ্রাম বাসী একনলা গাদা বন্দুক নিয়ে শুয়োর মারতে বেরিয়ে ছিল। চওড়া ও শুকনো একটা নালার ওপর মাচান বেঁধে বসে ছিল। রাত্রি আটটার সময় একটা বড় গোছের জন্তু দেখে, যতদূর সম্ভব টিপ করে গুলি করলো। গুলি খেয়ে জন্তুটা পাড় থেকে পড়ে গেল, লোকটার কয়েক ফুট দূর দিয়ে দাঁত কড়মড় করতে করতে পেছনের ঝোপে ঢুকে পড়লো। লোকটা কম্বল-টম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চোঁ-চোঁ বাড়ির দিকে দৌড়ালো।

পরদিন ভোরবেলায় খোঁজ শুরু হ'ল। ঝোপের তলায় রক্তে ভেজা জমি পরীক্ষা করতে কয়েকটি রক্ত মাখা লোম পাওয়া গেল। করবেটকে দেখাতে

তিনি বুঝলেন ওগুলো বাঘের লোম। আহত জন্তুটি শুয়োর নয়, বাঘ।

করবেট আহত বাঘটার খোঁজে বেরোলেন। পায়ের ছাপ দেখে করবেট বুঝলেন, এটি তাঁর 'পুরানো দোস্ত' 'রাজকুমার'।

করবেট ভীষণ সমস্যায় পড়লেন। সেই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। বাঘটা গুরুতর আহত! আঘাতের যন্ত্রণা এবং খিদের জ্বালায় এখন সে অনেকের ক্ষতি করতে পারে। এই অঞ্চলটি খুবই জনবহুল, কাজেই করবেট স্থির করলেন ওই অঞ্চল ছেড়ে যাবার আগেই তিনি তিনি বাঘটার একটা 'ব্যবস্থা' করবেন।

তিনদিন ধরে সর্বত্র খুজেও করবেট বাঘটার কোনও হদিশ পেলেন না। চারদিনের দিন বিকেলে রাজকুমারের খোঁজে বেরোবার মুখে এক বুড়ি ও তার ছেলের সঙ্গে দেখা হল। ওদের কাছে করবেট জানলেন যে, বাঘটাকে পাহাড়ের নীচে ডাকতে শোনা গেছে। জঙ্গলের সব গরু-মোষ দুদ্দাড় করে পালিয়েছে। ওরাও জঙ্গল ছেড়ে পালাচ্ছিল।

করবেট রাইফেল নিয়ে সর্বদাই একা বেরোতে অভ্যস্ত। এতে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে। এক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করতে হ'ল। বাঘটাকে কোথায় ডাকতে শোনা গেছে, জায়গাটা চিনিয়ে দেবার জন্যে করবেট ছেলেটিকে সঙ্গে নিলেন। পাহাড়ের নীচে পৌঁছে ছেলেটা করবেটকে একটা ঘন ঝোপ দেখিয়ে দিল। পিপলপানি নালা থেকে প্রায় একশো গজ দূরে প্রায় সমান্তরাল ভাবে কুড়ি ফুট চওড়া একটা নীচু জমি। করবেট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেদিকটা মোটামুটি ফাঁকা, নালাটার দিকটা ঝোপে ঢাকা। রাস্তা থেকে কুড়ি গজ দূরে নীচু জমিটায় একটা ছোট গাছ। বাঘটা যদি পথ ধরে আসে সেই ঝোপ পার হবার সময় তাকে গুলি করবার সুযোগ মিলবে। করবেট ঠিক করলেন সেইখানেই দাঁড়াবেন। ছেলেটাকে গাছের এমন ডালে চড়িয়ে দিলেন যেখান থেকে তার পাটা করবেটের মাথার নাগাল পায়। ছেলেটাকে বলে দিলেন সে যদি করবেটের আগে ঐ উঁচু জায়গা থেকে বাঘটাকে দেখতে পায় তাহলে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল করবেটের মাথায় ঠেকিয়ে ইসারা করবে। তারপর গাছে পিঠ দিয়ে করবেট বাঘিনীর ডাক নকল করে ডাক দিলেন।

প্রায় পাঁচশো গজ দূর থেকে বাঘটা সাড়া দিল। করবেট তিনদিন ধরে বন্দুকের ট্রিগারে হাত রেখে বাঘের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজেই পাঁচশো গজ দূর থেকে বাঘের সাড়া পেয়ে তাঁর মনে বেশ আশা হল। তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে ডাকা-ডাকি চললো। ছেলেটা দুবার ইশারা করলো। কিন্তু করবেট তখনও কিছু দেখতে পাননি। পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আলোয় জঙ্গল ভরে গেছে। সেই সময় বাঘটা হঠাৎ বেরিয়ে এলো। কোথাও না থেমে সোজা পথ ধরে দ্রুত হেঁটে ঝোপটা পার হয়ে গেল। তারপর নীচু জমিটার অর্ধেক পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করবেট গুলি করবার জন্যে রাইফেলটা তুলেছেন, ঠিক সেই সময় বাঘটা ডান দিকে ঘুরে সোজা করবেটে দিকে ছুটে এলো। এ অবস্থার জন্যে করবেট আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। করবেট যত দূরত্বে বাঘটাকে গুলি করতে চেয়েছিলেন, বাঘটা তার চেয়ে কাছে এসে গেছে। এ অবস্থায় বাঘের মাথায় গুলি করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু করবেট বাঘটার মাথায় গুলি করতে চান না। তাই পুরনো এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। এতে

বাঘটা ভয় পেল না, অথচ চট করে থেমে গেল। তারপর একটা থাবা তুলে আস্তে আস্তে মাথাটা উঁচু করতেই তার গলা আর বুক সরাসরি বন্দুকের পাল্লায় এসে পড়লো।

প্রচণ্ড ভারী বুলেটের আঘাতে কোন মতে উঠে দাঁড়িয়ে বাঘটা জঙ্গল ভেদ করে ছুটে পালাল। অবশেষে সকালে চিতল হরিণের ডাক শুনে করবেট, খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন, প্রথম যেখানে তিনি রাজকুমারের পায়ের ছাপ দেখে ছিলেন, তারই কয়েজ গজ দূরে 'রাজকুমার' তার শেষ শয্যা নিয়েছে।

বাঘটার আঘাত পরীক্ষা করে করবেট বুঝলেন, তাঁর আশঙ্কা ছিল অমূলক। তার ঘাটা—শুয়োর ভেবে গ্রামবাসী যে গুলি করেছিল সেটা প্রায় সেরে গিয়েছে। আসলে তার বিশেষ কিছু হয় নি। সামনের ডান পায়ের একটা শিরা ছিড়ে যায়। বাঘটা ছিল দশফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, চামড়া খানাও ছিল চমৎকার।

———

(২৩৬ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

—তুমি যা বললে, সব জিনিসের বেলায় তা হয় না কিন্তু !

—বোকার মতন কথা বোলো না চম্পা। কোনও জিনিস থেকে কিছু নিলে, সেটা আর সেখানে থাকবে না। জিনিসটা পরিমাণে কমে যাবে। নিতে নিতে ফুরিয়ে যাবে দেখবে আর নেই। যেমন তোমার পুডিং-এর বেলায় হয়েছে ?

চম্পার চেখে মুখে দুষ্টুমির হাসির ঝিলিক ! ঘাড় নেড়ে বলে—না বাপি, আমি জানি এমন একটা জিনিস আছে, যার থেকে যতই নেবে ততই সেটা বেড়ে যাবে ?

—তুমি এরকম জিনিস নিজে চোখে দেখেছ ?

—হাঁ, দেখেছি !

—কোথায় ?

—এখানেই। আমাদের বাগানে অনেক আছে !

সুকুমার উঠে বসেছে, অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে। খানিক বাদে জিজ্ঞেস করে—

—এ হতেই পারে না। জিনিসটা কি শুনি এবার !

চম্পা বলতে গিয়ে থেমে যায় ! হাসতে হাসতে বলে তুমি তো সব কিছুই জানো বাপি। একটু ভেবে দেখো, খুঁজে পাবে ! চম্পা একছুটে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

সুকুমার অসহায় ভাবে চারদিকে তাকায় ! যতই নেবে, ততই বেড়ে যাবে এ আবার কেমন বস্তু !

সবজান্তা সুকুমারের দিবানিদ্রা শিকেয় উঠলো। ভাবছে তো ভাবছে। বাগানের ভেতর এরকম অদ্ভুত বস্তুর হদিশ মিলছে না !

সামনের গাছের ডালে একটা কাক 'কা, কা' করছে। মরিয়া হয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করে—বলতে পার। বস্তুটা কি ?

কাকটা উড়ে চলে গেল। সুকুমারের প্রশ্নের উত্তর মিললো না।

সুকুমারের এ সমস্যার সমাধান তোমরা করে দিতে পারবে ?

———

বুদ্ধির্যস্য.....

উত্তর :

১। এক সঙ্গে সাতটা ডিম সিদ্ধ করতে ৩½ সাড়ে তিন মিনিট সময়-ই লাগবে।

২। রঘুর মাথার বস্তা ছিল কয়লা ভর্তি। ধনিয়ার মাথার তিনটে বস্তাই ছিল খালি।

৩। মোট ১২ বারোটা, প্রতিমাসে একটি। যেমন সেকেণ্ড (২রা) জানুআরি, সেকেণ্ড (২রা) ফেব্রুআরি, সেকেণ্ড (২রা) মার্চ, ইত্যাদি !

৪। বাড়বে, কমবে না—গর্ত। যত মাটি তুলে নেবে, গর্তটা বেড়ে যাবে, কমবে না।

———

নিকোলাস নিকলেবি

চার্লস ডিকেন্স

রূপান্তর : **ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসু**

১

লণ্ডনের পথ দিয়ে চলেছে একটি ছেলে। বেশ লম্বা-চওড়া, সুন্দর গড়ন। বয়েস উনিশের কাছা-কাছি। হাতে তার একটা ছোট কাগজের প্যাকেট। গোল্ডেন স্কোয়ারে একটা অফিসে সেটা পৌঁছে দেবার কথা।

অফিসের সামনে এসে দরজায় কড়া নাড়তেই একজন লোক দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়ালো। লোকটির পরনে পুরনো বাদামী রঙের স্যুট, কানে একটা পেন গোঁজা।

কি ওটা—প্যাকেটটা দেখিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

কাকা এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—ছেলেটি উত্তর দিলো।

কাকা—! লোকটি আশ্চর্য হলো।

হ্যাঁ, মিঃ নিকলেবি—।

ভেতরে এসো—।

ছেলেটিকে চেয়ারে বসিয়ে লোকটি নিজে একটি উঁচু টুলে বসলো। তারপর ছেলেটিকে ভালো করে দেখতে লাগলো।

মিঃ নিকলেবি কোন উত্তর চাননি—ছেলেটি প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখলো।

কোন জবাব না দিয়ে একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে সে চেয়ে রইলো।

ছেলেটি ভাবলো সে বুঝি কালা! তার হাবভাবও তার কাছে অদ্ভুত লাগলো। চলে যাবার জন্যে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

আমার এখানে থাকার কোন দরকার নেই—বেশ চেঁচিয়ে বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

লোকটি টুল থেকে নেমে তার পথ আগলে তাকে সব কথা বলতে বললো।

ছেলেটি তখন কাকার সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে আদ্যোপান্ত সব বললো।

সব কথা শুনে লোকটি বললো—আমার নাম নিউম্যান নগ্‌স্‌। সিলভার স্ট্রীট ও জেম্‌স্‌ স্ট্রীটের মোড়ে কোণের বাড়িটায় আমি থাকি। লণ্ডনে যদি তোমার কখনো আশ্রয়ের দরকার হয় আমার কাছে এসো।

ছেলেটি তার কথায় আশ্চর্য হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। খানিকদূর চলার পর ছেলেটি পেছন ফিরে দেখলে লোকটি তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

ছেলেটির নাম নিকোলাস নিকলেবি। তার কাকার নাম র‍্যালফ নিকলেবি। লোকটি হচ্ছে র‍্যালফের অফিসের কেরাণী।

২

নিকোলাসের পিতা ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, স্পষ্টবাদী, উদারপ্রকৃতির ও সদা হাসিখুশী। সামান্য রোজগার করতেন। তাতেই সুখে শান্তিতে তাদের সংসার চলতো। নিকোলাস ও তার বোন কেটি দুজনেই যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছিল। কেটির বয়েস প্রায় সতেরো বছর। সঞ্চয় বলতে তার পিতার কিছুই ছিল না।

হঠাৎ একদিন এই সুখের সংসারে দুঃখের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। নিকলেবি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা রেখে মারা গেলেন।

এ খবর গিয়ে পৌঁছলো নিকোলাসের কাকার কাছে। তাঁর কোন পরিবর্তন হলো না। তিনি ছিলেন তাঁর ভাই-এর বিপরীত। খুব নিষ্ঠুর ও নীচ প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে অর্থ ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। এমন কি অর্থের জন্যে হীন কাজ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

র‍্যালফ নিকোলাসদের বাড়িতে গেলেন। তিনি এখন তাদের একমাত্র ভরসা। দরজা খুলে নিকোলাস কাকাকে অভ্যর্থনা জানালো।

দোতলায় তারা থাকে। বাড়ির কর্ত্রী মিস্ লা ক্রীভি একতলায় থাকেন। পেশায় তিনি চিত্রকর। ঘরে ঢুকে র‍্যালফ দেখলেন মেয়ের হাতে ভর দিয়ে তাঁর শোক বিহ্বলা ভ্রাতৃবধূ বসে রয়েছেন। র‍্যালফ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সব দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করতে বললেন।

এযে আমার বিরাট ক্ষতি হলো—রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আক্ষেপের সুরে বললেন মিসেস্ নিকলেবি।

স্বামী-স্ত্রীরা ত' রোজই মরে—এ আর এমন কি!—নির্বিকার ভাবে র‍্যালফ বললেন।

এবং ভাইরাও—নিকোলাসের কথায় রাগ ফুটে উঠলো।

হ্যাঁ, ছোটরাও—বসতে বসতে ঠাট্টা করে র‍্যালফ বললেন।

নিকোলাস প্রথম থেকেই কাকার চালচলন এবং কথাবার্তা শুনে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল। তার জীবিকার প্রশ্ন উঠলে সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল, তার মায়ের ওপর নির্ভর করে সে থাকবে না। এমনকি তার কাকার অনুগ্রহের ওপরেও না।

আমার স্বামী কিছুই রেখে যান নি। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন কোন সাহায্যের দরকার হলে যেন আপনারই শরণাপন্ন হই। আমি আশা করি আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের ছেলেমেয়ের জন্যে কিছু করবেন।

কেটির জন্যে একটা বোর্ডিং স্কুলে চাকরির চেষ্টা করতে হবে। আমি আশাকরি তুমি তা' পারবে?—কেটির দিকে তাকিয়ে র‍্যালফ বললেন।

আমি যে কোন কাজ করতেই চেষ্টা করবো—কাঁদতে কাঁদতে কেটি বললো।

আচ্ছা, আচ্ছা—একটু করুণা দেখিয়ে আবার বললেন—

যদি কাজটা খুব শক্ত মনে করো তাহলে তুমি জামা-কাপড় তৈরি করার চেষ্টা কর।

তারপর নিকোলাসকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি কখনও কিছু করেছ?

না—উত্তর দিলো নিকোলাস।

না—তা আমি জানতুম। হায়রে! ভাই আমার ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে! যাই হোক, তুমি কি কাজ করতে ইচ্ছুক?

নিশ্চয়ই—।

তাহলে দেখ, আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—এই বলে তিনি পড়তে লাগলেন—

ইয়র্কশায়ারে গ্রেটা ব্রীজের কাছে মিঃ ওয়াকফোর্থ স্কুইয়ার্স পরিচালিত ডোথবয়েজ হল। আবাসিক ছাত্রাবাস। খাওয়া, জামাকাপড় ও হাত খরচ দেওয়া হয়। বছরে কুড়ি পাউণ্ড মাইনে লাগে। কোন ছুটি নেই।

মিঃ স্কুইয়ার্স রোজ বেলা একটা থেকে চারটে পর্যন্ত সারাসেন্‌স্ হেড, স্নো হিল-এ নতুন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করবেন।

পুনশ্চ ঃ—একজন কর্মঠ সহকারী আবশ্যক। বাৎসরিক বেতন পাঁচ পাউণ্ড।

যদি সে এই কাজটা পায়, তার কোন সমস্যা থাকবে না। আর যদি সে না পছন্দ করে, তবে নিজেই একটা কাজ খুঁজে নিক। কোন বন্ধু, টাকা অথবা ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়া এর থেকে ভালো আর কিছুই পাবে না।—বললেন র‍্যালফ।

বল, বাবা নিকোলাস, কিছু বল—সাগ্রহে মা শুধালেন।

হ্যাঁ মা, হ্যাঁ—চাকরি করবো—ধীর অথচ চিন্তাভারাক্রান্ত মনে উত্তর দিলো।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করলো—ভাগ্য জোরে যদি কাজটা পেয়েই যাই, তাহলে আমার মা-বোনকে কে দেখবে ?

তুমি যদি চাকরিটা পাও, তখনই আমি তোমার মা-বোনের ব্যবস্থা করবো—বললেন র‍্যালফ।

শেষ পর্যন্ত স্কুইয়ার্সের ডোথবয়েজ হল-এ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মাস্টারের পদে নিকোলাসের চাকরি ঠিক হয়ে গেল।

পরদিন সকাল আটটার সময় ঘোড়ার গাড়িতে স্কুইয়ার্সের সঙ্গে লণ্ডন থেকে ইয়র্কশায়ারে যাত্রা করলো।

এখান থেকেই শুরু হ'লো তার নতুন জীবন, নতুন অভিজ্ঞতা।

৩

লণ্ডন থেকে ইয়র্কশায়ার অনেক দূরের পথ। নিকোলাস এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে গাড়িতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ স্কুইয়ার্সের চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ির জানলা দিয়ে একটা বাড়ি দেখতে পেল। তার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়লো। মা-বোনের কথা ভেবে তার মন কেঁদে উঠলো।

শিগগীর ওঠো—বললেন স্কুইয়ার্স। তারপর তাকে ঠেলতে ঠেলতে একটা বড় হল ঘরে ঢুকলেন। সেখানে মিসেস্ স্কুইয়ার্স এলেন।

স্কুইয়ার্সের থেকে তিনি লম্বা, একটা ময়লা আলখাল্লা তার গায়ে।

মিসেস স্কুইয়ার্স ছেলেদের 'ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। বেত হাতে স্কুইয়ার্স, পিছনে নিকোলাস'

এটি আমাদের নতুন লোক—নিকোলাসকে দেখিয়ে স্কুইয়ার্স বললেন।

ও, তাই নাকি ?—মিসেস স্কুইয়ার্স ছেলেটিকে দেখতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—কতখানি সে খাবে আর কতটুকুই বা তিনি খাওয়াবেন।

এমন সময় একটি ছেলে ঘরের মধ্যে কয়েকটা থালা এনে টেবিলের ওপর রাখলো।

স্কুইয়ার্স পকেট থেকে কয়েকটা চিঠি বার করলেন।

ওহে স্মাইক, তুমি কি ভাবছো ?—স্কুইয়ার্স জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ কি আমাকে চিঠি দিয়েছে ?—স্মাইকের কণ্ঠে হতাশার ভাব।

একটা অক্ষরও না। কেউ কোনদিন লিখবেও না। তোমার জন্যে ত' কেউ টাকা পাঠায় না। অথচ আমি তোমায় খাওয়াই, পরাই—সেটাই কি যথেষ্ট নয় ?

কোন কথা না বলে স্মাইক নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখান থেকে চলে গেল।

এতক্ষণ নিকোলাস তাকে দেখছিল। বয়েস তার আঠারো। সে যে জামা-প্যান্ট পরেছিল দেখলেই বোঝা যায় তার জন্যে তৈরী নয়। জামাটা অনেক বড় তার তুলনায় প্যান্টটা অনেক ছোট।

মিসেস স্কুইয়ার্স চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে একটা বড় কাঠের বাটি—তাতে যেন কি রয়েছে। তিনি সেটাকে টেবিলের ওপরে রাখলেন।

ছেলেরা তাঁকে দেখেই আতঙ্কে ঘরের এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলো।

ছেলেদের মাঝে মাঝে রক্ত পরিষ্কার করার দরকার হয়—বুঝলে নিকোলাস। উনি ছেলেদের মায়ের মতো ভালোবাসেন। তাই এখন তিনি ছেলেদের ওষুধ খাওয়াবেন।

গন্ধক আর ঝোলাগুড় মিশিয়ে এই ওষুধ তৈরী। এতে ক্ষুধার জ্বালা অনেক কমে যাবে—বেশি খাওয়াতে হবে না।

মিসেস স্কুইয়ার্স এক একটা ছেলেকে ধরে জোর করে হাঁ করিয়ে কাঠের চামচ দিয়ে মুখের মধ্যে সেই ওষুধ ঢেলে দিতে লাগলেন।

অন্য ছেলেরা তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

তারপরেই শুরু হলো পড়া। ছেলেদের জীবনে সে এক বিড়ম্বনাময় যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়। পড়ার নামে ছেলেদের অমানুষিক পরিশ্রম ও অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হতো।

বোল্ডার, তোমার বাবা ত' কিছুই টাকা দেননি। এদিকে এসো—স্কুইয়ার্স ডাকলেন।

একটি শীর্ণকায় ছেলে তাঁর ডেস্কের কাছে এগিয়ে এলো। ভয়ে তার মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বোল্ডার, তুমি একটা বদমাশ ছেলে। আগে মার খেয়েও দেখছি কিছুই হয়নি। এসো, তোমাকে আবার উত্তম-মধ্যম দেওয়া যাক।—এই বলে স্কুইয়ার্স তাকে অকারণে বেতের পর বেত মারতে লাগলেন।

এভাবে তখনকার মতো ক্লাস শেষ হ'লো।

স্কুইয়ার্স ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিকোলাস একলাই বসে রইলো ছেলেদের কাছে। ঘরের এককোণে স্মাইক বসে কাঁপছে আর নিকোলাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে ?—স্নেহভরা কণ্ঠে নিকোলাস শুধালো।

ন্-ন্-না—জোরে মাথা নাড়লো স্মাইক।

তুমি যে কাঁপছো— ?

না, আমি কাঁপছি না—। এটা আমার অভ্যেস—

খুব তাড়াতাড়ি কথাগুলো বললো স্মাইক।

আহা, বেচারা! নিকোলাস বুঝতে পারলো ভয় পেয়েই সে সত্যি কথাটা বলছে না।

এমন করুণামাখানো কথা স্মাইক কোনদিন শোনেনি। ঝরঝর করে তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

নিকোলাস কি বলবে কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু বললো—হতাশ হয়ো না।

বোর্ডিং হাউসের কাণ্ডকারখানা দেখে নিকোলাস খুব বিষণ্ণ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। স্কুইয়ার্সকে সাহায্য তাকে করে যেতেই হবে যদিও সে জানতো এরকম নিষ্ঠুর ও হীন প্রকৃতির মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো। তার বোনের কথাও সে ভাবতে লাগলো। কাকা তাকে হয়তো এমন কোন কাজ দেবেন না যা সে পছন্দ করে না। যেমন তার নিজের বেলায় হয়েছে। আবার মায়ের কথা ভেবেও সে খুব চিন্তিত হলো। সে কাজ ছেড়ে দিলে মা হয়তো তার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হবেন। এসব ভেবেই সে ডোথবয়েজ হল-এ থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

৪

নিকোলাসের সঙ্গে স্মাইকের ভালোবাসার বন্ধনটা দিনদিনই বেড়ে যেতে লাগলো। এটা কিন্তু স্কুইয়ার্সের মনঃপুত হতো না। স্মাইকের ওপর তার অত্যাচারও ক্রমে বাড়তে লাগলো।

একদিন সকালবেলায় স্মাইককে তার বিছানায় পাওয়া গেল না।

এখবর স্কুইয়ার্সের কানে যেতেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেত হাতে ছেলেদের ঘরে এলেন। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—

নিকোলাস, স্মাইককে এখানে নিয়ে এসো।

এখানে সে নেই—।

ছেলেদের রক্ত চক্ষু দেখিয়ে হাতে বেত দুলিয়ে স্কুইয়ার্স বললেন,—কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ? আমার মনে হয় সে পালিয়ে গেছে, মাস্টারমশাই — একটি ছেলে বললো।

একথা শুনে বেশ কয়েক ঘা বেত কষিয়ে দিলেন ছেলেটিকে।

তারপর নিকোলাসকে বললেন—তুমি জানো সে পালিয়েছে। আর এও জানো কোথায় সে পালিয়েছে!

যদি সে পালিয়েই থাকে তবে আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হবো না।

নিকোলাস মিঃ কোলিয়ারের টুপি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

মিসেস স্কুইয়ার্স বুঝতে পারলেন যে সত্যিই স্মাইক পালিয়েছে। তাঁরা দুজনে স্মাইককে খুঁজে বার করবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন রাতে নিকোলাসের ভালো ঘুম হলো না। তার সমস্ত চিন্তা তখন স্মাইককে ঘিরে।

পরদিন সকালবেলা চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখলো স্মাইক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জামাকাপড় ছেঁড়া, সর্বাঙ্গ কাদামাখা—তাকে চেনাই যাচ্ছে না। তার আশ্চর্য লাগলো—যার জন্যে পয়সাকড়ি দেওয়া হয় না—সেই পালিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে বার করার জন্যে কত কষ্টই না করা হয়েছে।

দুপুরবেলা সব ছেলেদের ঘরে আনা হলো। মিসেস স্কুইয়ার্স স্মাইককে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন।

স্কুইয়ার্স তার হাত চেপে ধরে বেতের পর বেত মারতে লাগলেন।

এ যন্ত্রণার হাত থেকে তাকে মুক্ত করতে কেউ এগিয়ে এলো না।

থামুন! এ কখনোই চলতে দেওয়া যায় না—হঠাৎ নিকোলাস গর্জে উঠলো।

স্কুইয়ার্স বিস্মিত হয়ে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণেই রাগে চিৎকার করে উঠলেন—চুপ করে বসো। হতভাগা!

এতদিন চুপ করেই থেকেছি। এ নিষ্ঠুরতা আর সহ্য করবো না।

নিকোলাসের কথা শেষ হতে না হতেই বেতের ঘা পড়লো তার মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে লাল দগদগে রেখা ফুটে উঠলো মুখে। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো সে স্কুইয়ার্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাঁর হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়ে সেই বেত তাঁর ওপরেই চালাতে লাগলো।

ছেলেরা বিস্ময় দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলো।

এদিকে স্কুইয়ার্সের কোট চেপে ধরে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী। মেয়ে নিকোলাসের মাথা লক্ষ্য করে কালির বোতল ছুঁড়ছে। আর ছেলে পেছনদিক থেকে তাকে মারছে।

সেদিকে নিকোলাসের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে স্কুইয়ার্সকে বেত মেরেই চলেছে। যখন তার হাত আর চলছে না তখন সে তাঁকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলো। তার ধাক্কায় দুজনেই ছিটকে মাটিতে পড়লেন। স্কুইয়ার্স অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রইলেন।

নিকোলাস যখন বুঝলো স্কুইয়ার্স মরে যায়নি তখন সে বাড়ি ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো।

স্মাইককে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ তার নিউম্যানের কথা মনে পড়লো। সে স্থির করলো তার কাছেই যাবে।

রাস্তায় এক জায়গায় একটা শূন্য খামারবাড়িতে ঢুকে এককোণে শুয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো।

পরদিন সকালে নিকোলাস জেগে উঠে দেখলো অদূরে স্মাইক বসে আছে। স্মাইক তার সঙ্গী হতে চাইলো। কিন্তু নিকোলাস তাকে কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারে! তবু নিকোলাস তাকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনের পথে এগিয়ে চললো।

৫

লণ্ডনে পৌঁছে তারা নিউম্যানের বাড়িতে গিয়ে উঠলো। তাদের দেখে নিউম্যান আশ্চর্য হলো।

নিকোলাস জানতে পারলো কাকা তার সম্বন্ধে মা-বোনের কাছে বোর্ডিং হাউসের ঘটনা বেশ বাড়িয়েই বলেছেন। কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি।

সে ঠিক করলো নিজে গিয়ে সেখানকার আসল রূপ প্রকাশ করবে।

বাড়িতে পৌঁছে দেখে তার কাকা আগেই সেখানে হাজির। সকলেই বেশ উত্তেজিত।

নিকোলাসকে দেখে কাকা বললেন—এই যে, তুমি এসে গেছ, ভালই হয়েছে। তুমি থাকো আর তোমার মা-বোনকে দেখাশুনা করো। আমি চললাম।

দাঁড়ান! আপনাকে যেতে হবে না—আমিই চলে যাচ্ছি। ঘৃণায় ও রাগে তাঁর সামনে থেকে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়ালো

মা-বোনকে ছেড়ে চলে আসার বেদনা তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললো। সে ঠিক করলো নিজেই তার জীবিকার একটা ব্যবস্থা করে নেবে। মা-বোনকে সে দেখাশুনা করবে।

মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সে নিউম্যানের বাড়িতে এলো। স্মাইককে জানালো পরের দিনই তারা লণ্ডন ছেড়ে চলে যাবে।

৬

নিকোলাস বাড়ি থেকে চলে যাবার পর তার কাকা কেটির জন্যে একটা কাজের বন্দোবস্ত করলেন। মিসেস উইটিটারলি নামে এক মহিলাকে দেখাশুনার জন্যে তার বাড়িতে তাকে থাকতে হতো। মাঝে মাঝে সে তার মাকে দেখতে আসতো।

একদিন কেটি তার মনিবের সঙ্গে একটা থিয়েটারে গেল। সেখানে কেটি তার মাকে দেখে অবাক! মায়ের সঙ্গে আরো দুজন লোককে দেখে বিস্ময় ও ঘৃণায় তার মন ভ'রে উঠলো।

এরা হচ্ছেন—সার মুলবেরি হক ও লর্ড ফ্রেডরিক ভেরিসফট্। এরা ব্যবসা সূত্রে তার কাকার সঙ্গে জড়িত।

একবার কাকার বাড়িতে এঁরা কেটির সঙ্গে অপমানজনক দুর্ব্যবহার করেন। সেই থেকে তার মন এঁদের প্রতি বিষাক্ত হয়ে রয়েছে।

আবার তাঁদের কবলে যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে কেটি তার কাকার কাছে গেল। কাঁদতে কাঁদতে সে কাকাকে অনুরোধ করলো যেন তিনি তাঁদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

কিন্তু কাকা জানালেন তিনি অপারগ।

অসীম দুঃখ আর অপমানের বোঝা নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে দেখলো নিউম্যান তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আস্তে আস্তে বললো—কেঁদোনা। আমি শিগগীর তোমার সঙ্গে দেখা করছি। সঙ্গে আরো একজন থাকবে।

৭

শীতের প্রায় শেষ।

ভোরবেলা তখনো ঠাণ্ডা আর কুয়াশায় চারদিক ঢাকা।

এমনি এক সকালে নিকোলাস ও স্মাইক লণ্ডন ছেড়ে পোর্টসমাউথ-এর অভিমুখে রওনা হলো। পোর্টসমাউথ একটা বন্দর। তাদের আশা সেখানে তারা একটা কাজ পাবে।

দিনের বেলা তারা পথ চলে। রাত্রে কোথাও একটা আশ্রয় জুটিয়ে নেয়। এইভাবে তারা পোর্টসমাউথ-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছলো।

সেখানে একটা সরাইখানায় রাত কাটাবে স্থির করলো। সেই সরাইখানায় তখন নাবিকদের জন্যে নাটকের মহড়া চলছে।

থিয়েটারের মালিকের নাম ক্রুমলেস। তাদের দুজনকে দেখে মালিক ভাবলো এরা নিশ্চয়ই

কোন কাজের জন্যে এসেছে।

নিকোলাসকে সে নাটক লেখার জন্যে বললো। এজন্যে সে পারিশ্রমিক পাবে আর তাদের সঙ্গে তারা থাকতে পারবে।

এখানে নিকোলাস তার আসল নাম গোপন রেখে জন্‌সন্‌ ছদ্মনামে পরিচিত হলো।

নিকোলাস তাদের দলভুক্ত হবার পর ক্রমে ক্রমে থিয়েটার কোম্পানীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সেই সঙ্গে নিকোলাসের অভিনয়েও সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লেনভিলে নামে একজন লোক কিন্তু নিকোলাসকে সহ্য করতে পারছিল না। একদিন সে ফোলেয়ার নামে একজনকে তার কাছে পাঠালো।

সে নিকোলাসের কাছে গিয়ে জানালো তার থিয়েটারে যোগ দেবার পর থেকে কেউ আর লেনভিলেকে পছন্দ করে না। লেনভিলে এখন অপাঙ্‌ক্তেয়। সে আগামীকাল তাকে দেখা করতে বলেছে। সকলের সামনে তার বদলা নেবে।

একথা শুনে নিকোলাস রেগে আগুন। তার মাথা থেকে টুপী খুলে নিয়ে দরজার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—খুব আস্পর্দ্ধা তোমার! যাও, টুপীর পেছনে ধাওয়া করো।

পরে যখন লেনভিলের সঙ্গে দেখা হয় তখন নিকোলাস তাকে সকলের সামনে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে।

৮

একদিন সে নিউম্যানের কাছ থেকে একটা চিঠি পায়। তাতে লেখা ছিল কেটি তার সাহায্য চায়। চিঠি পেয়েই স্মাইককে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

বাড়িতে পৌঁছে সে কাউকে দেখতে পেল না। সমস্ত ব্যাপার জানবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠলো।

বাড়িতে থাকতে তার মন চাইলো না। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। সারাদিন তার খাওয়া হয়নি। কিছু খাবার জন্যে সে হোটেলে ঢুকলো। একটা চেয়ারে বসে ওয়েটারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঠিক তার সামনে চারজন লোক একটা টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে। তাদের আলাপ-আলোচনা সে শুনছিলো। হঠাৎ একজনের মুখ থেকে তার বোন কেটির নাম আর তার সম্বন্ধে কটূক্তি শুনে সে ভীষণ রেগে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে সে জানতে চাইলো তার নাম। লোকটা তার নাম জানাতে চায় না। নিকোলাসও নাছোড়াবান্দা। আসলে চারজনের মধ্যে দুজন হলো সার মুলবেরি হক এবং লড ফ্রেডরিক ডেরিসফ্‌ট্‌। হকই কেটির সম্বন্ধে কটূক্তি করেছিলেন।

নিকোলাস তাকে চিনতে পারেনি কারণ সে তখন ডোথবয়েজ হল-এ।

লোকটি হোটেল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন। নিকোলাসও লাফিয়ে গাড়ির পাদানীতে উঠলো। লোকটি নিকোলাসকে গাড়িতে দেখে চাবুক দিয়ে তার মাথায় ও কাঁধে মারতে লাগলো।

নিকোলাস চাবুকটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো। চাবুকের হাতল দিয়ে লোকটির মাথায় আঘাত করে তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিলো। লোকটি খুব আঘাত পেল।

নিকোলাসও যথেষ্ট আহত হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। নিউম্যান তার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি তার ক্ষতস্থানে ওষুধ দিতে এগিয়ে এলো।

নিকোলাস সেসব কিছুই গ্রাহ্য না করে নিউম্যানের কাছ থেকে তার বাড়ির ব্যাপার শুনতে চাইলো। তার বোনের কথা শুনে তার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

পরদিন ভোরেই সে উইটিটারলির বাড়ি থেকে কেটিকে নিয়ে এলো।

কাকাকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলো তার কোন সাহায্য তারা নেবে না। এমন কি তার সঙ্গে তারা আর দেখাও করবে না।

যে সময়ে তার কাকা চিঠিটা পেলেন তখন স্কুইয়ার্সও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাঁর মুখ থেকে র‍্যালফ হোটেলের ঘটনা শুনলেন।

আমার মনে হয় তুমি তাকে ক্ষমা করোনি। অথবা তাকে উচিত শিক্ষা দেবার সুযোগও হারাও নি।

একটা উপায় বলুন, দেখুন আমি কি করতে পারি— ।

সেজন্যেই কি তুমি আমার কাছে এসেছ? ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে দেখি— ।

তাঁরা দুজনে নিকোলাস ও স্মাইককে জব্দ করার ফন্দি আঁটলেন।

৮

বাড়িতে ফিরে নিকোলাসের চিন্তা হলো কি করে তাদের সংসার চলবে। থিয়েটারের দলে এখন আর তার চাকরি করা চলবে না। কারণ তার মা-বোনের পক্ষে সেখানে বাস করা একেবারেই অসম্ভব।

চাকরির চিন্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। সেখানে চাকরির একটা বিজ্ঞাপন দাঁড়িয়ে দেখছিল।

হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে এক বুড়ো ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে তার হাসি হাসি ভাব।

কি চাকরি খুঁজছো? এত কম বয়েসেই চাকরি করা দরকার? —বুড়ো জিজ্ঞেস করলেন।

নিকোলাস সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে উদ্যত হ'লো।

কি কিছু বললে না?—পথ আগলে লোকটি জিজ্ঞেস করলেন।

নিকোলাসের মনে কি হলো। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলো হয়তো তার দ্বারা কিছু সাহায্য হতে পারে। তার কাছে কিছুই গোপন না করে সব বললো। লোকটি তার কথা শুনে

ম্যাডেলিনদের বাড়িতে নিকোলাস : টেবিলে ম্যাডেলিন, পিছনে তার বাবা

তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁর ভাই-এর কাছে।

তাদের দুজনকে দেখে নিকোলাস অবাক। দুজনের এক মুখ, এক চেহারা, এক জামাকাপড়—এমনকি একই জায়গার দাঁত দুজনের নেই! তফাতের মধ্যে একজন একটু রোগা, অন্যজন একটু মোটা।

এঁরা হলেন চার্লস ও নেড চীরিব্‌ল্। জার্মানী থেকে মাল আমদানি করা এঁদের ব্যবসা। এখানেই নিকোলাসের চাকরি হ'লো। বছরে দেড়শ পাউণ্ড মাইনে।

নিকোলাসের চাকরির কথা শুনে বাড়ির সকলেই খুব খুশী। তারা পুরনো বাড়ি ছেড়ে এঁদেরই একটা ছোট্ট বাড়িতে নামমাত্র ভাড়ায় বাস করতে লাগলো।

৯

গাড়ি থেকে পড়ে যাবার পর সেই যে মুলবেরি হক বিছানা নিয়েছেন আর উঠতে পারেন নি। তার মুখ ক্ষত-বিক্ষত। সমস্ত মাথায় ও মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—চোখ, মুখ ও নাক দেখা যাচ্ছে না।

লর্ড ভেরিসফ্‌ট্ তাঁর বিছানার পাশে বসে রয়েছেন মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

এমন সময় র‍্যালফ সেখানে এলেন। তিনি হকের আঘাত দেখে শিউরে উঠে দুপা পিছিয়ে গেলেন।

কি দেখছেন? আমি তার ওপর এমন প্রতিশোধ নেব যে জীবনের শেষ পর্যন্ত তার সাক্ষী হয়ে থাকবে—রাগে গর্জে উঠলেন হক।

আপনার ইচ্ছামত আপনি আমার ভাইপোকে শাস্তি দেবেন। আমার কিছুই বলার নেই। তাকে হিংস্র কুকুরদের মুখেও ফেলে দিতে পারেন—বললেন র‍্যালফ।

ভেরিসফ্‌টের হৃদয়ে মায়া মমতা ছিল। একটা নিরীহ বালকের ওপর এমন নির্দয় শাস্তির কথা শুনে তিনি হককে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হক তার সিদ্ধান্তে অটল।

এর কিছুদিন পর দুই বন্ধুতে ঘোড়ার রেস দেখতে গেছেন। দিনের শেষে তাঁরা বন্ধুদের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছেন আর গেলাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাঙছেন। সেই সময় আবার নিকোলাস প্রসঙ্গ উঠলো। হক খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। দুই বন্ধুতে বচসা শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ হক দুহাতে ভেরিসফ্‌টের গলা চেপে ধরলেন। ভেরিসফ্‌ট্‌ও তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনে মারামারি শুরু হ'লো। বন্ধুরা তাঁদের দুজনকে দুদিকে সরিয়ে নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ও মেরেছে! ওয়েস্টউড, তুমি কি আমার কথা শুনছো?—চিৎকার করে উঠলেন মুলবেরি।

হ্যাঁ আমি মেরেছি—আর কেন সে তা' ভালভাবেই জানে। ক্যাপ্টেন অ্যাডামস, আমাকে বলতে দাও। —বললেন ভেরিসফ্‌ট্।

কেউ কারোর কথা শোনে না—দুজনে কেউ কারোর কাছে ক্ষমাও চায় না। শেষে তাঁদের বন্ধুরা দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যবস্থা করলো।

পিটার শ্যাম থেকে হ্যামহাউস যাবার পথের নদীর ধারে সারি দেওয়া গাছের মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা। এখানেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যবস্থা হলো।

তখন দিনের আলো সবেমাত্র ফুটে উঠেছে। চারদিক পরিষ্কার—কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। সমান দূরত্বে দুজনে দুদিকে দাঁড়িয়ে—হাতের মুঠোয় ধরা পিস্তল। দুজনের বন্ধুরা দুদিকে দাঁড়িয়েছে।

সংকেত দেওয়ামাত্র দুটো গুলির আওয়াজ প্রায় একই সময়ে শোনা গেল। আর দেখা গেল লর্ড ভেরিসফ্‌ট্ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। বন্ধুরা

তাকে সেখানে ফেলে চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশে সূর্য উঠলো।

পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে ডেকে উঠলো।

এইভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিষ্পত্তি হ'লো দুই বন্ধুর ঝগড়া।

১০

এক রবিবারের সন্ধ্যেবেলায় নিকোলাসের বাড়িতে তার দুই মনিব এবং তাঁদের ভাইপো ফ্র্যাঙ্ক চায়ের নিমন্ত্রণে এলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁরা অনেকক্ষণ গল্প করে কাটালেন।

চলে যাবার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময়ে দরজায় দুমদুম করে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হ'লো। পরমুহূর্তে র‍্যালফ নিজেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে সেখানে দেখে সবাই অবাক। ফ্র্যাঙ্ক লক্ষ্য করলেন বাইরে আরো যেন কেউ লুকিয়ে রয়েছে। দরজার দিকে এগোতেই ঘরে ঢুকলেন স্কুইয়ার্স সঙ্গে আর একজন।

ইনি স্মাইকের বাবা—নাম স্নলি। নিকোলাস স্মাইককে চুরি করে নিয়ে এসেছে শুনে তাকে নিতে এসেছেন।—র‍্যালফ বললেন।

স্মাইক সে কথা শুনে নিকোলাসের পেছনে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো—আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।

নিকোলাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করে থাকতে বললো।

স্কুইয়ার্স স্মাইকের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিকোলাস তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো।

আপনার গায়ের দাগগুলোর কথা কি ভুলে গিয়েছেন? —রাগে নিকোলাস তাকে জোরে ধাক্কা দিলো। স্কুইয়ার্স দরজার বাইরে ছিটকে গিয়ে পড়লেন।

র‍্যালফ বুঝতে পারলেন তাঁর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। স্মাইককে না পেয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন। যাবার সময়ে নিকোলাসকে শাসিয়ে গেলেন—তোমার এই দম্ভ ও একগুয়েমির ফল খুব তাড়াতাড়িই পাবে।

নিকোলাসের দুই মনিব এতক্ষণ চুপ করে বসে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। র‍্যালফ ও স্কুইয়ার্সকে চিনতে তাঁদের কষ্ট হয়নি।

তারা চলে গেলে নিকোলাস স্মাইকের ওপর অত্যাচারের কথা জানিয়ে তাঁদের সাহায্য চাইলো। তাঁরা কথা দিলেন স্মাইককে কেউ তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

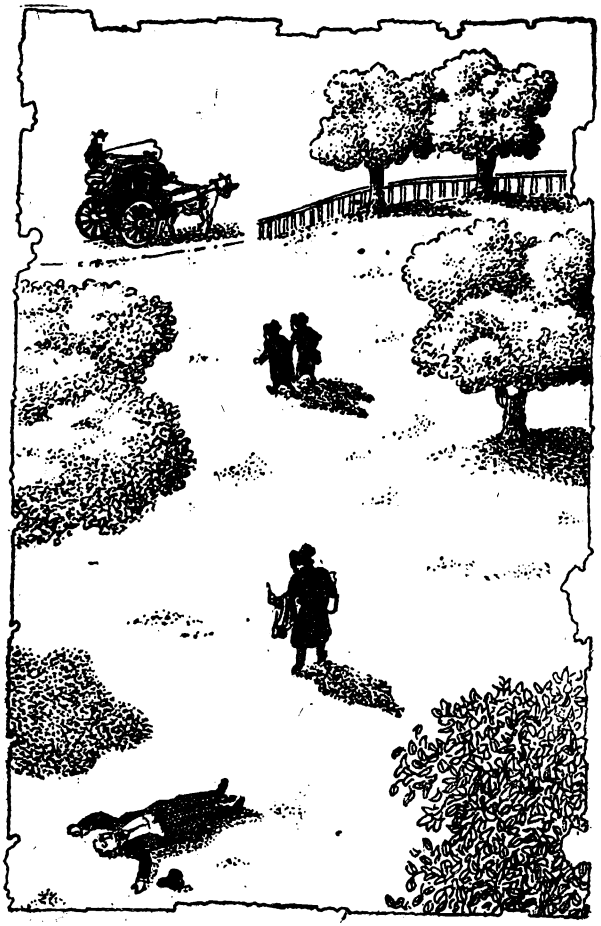

হুক-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লর্ড ভেরিসফট নিহত। বন্ধুরা চলে যাচ্ছেন।

১১

ম্যাডেলিন ব্রে নামে এক মহিলা প্রায়ই চীরিব্‌ল্‌ ভাইদের কাছে সাহায্য নিতে আসতো। তার বাবা ছিলেন নিষ্কর্মা—নানা রোগে ভুগতেন। মেয়ের রোজগারের পয়সায় দিব্যি বসে দিন কাটাতেন। হৃদয়ে তাঁর মায়ামমতা বলে কিছুই ছিল না। আবার আত্ম-অভিমানও ছিল খুব। অন্য কারুর দয়ার ওপর থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। ফলে একদিন চীরিব্‌ল্‌ ভাইদের কাছে তাঁর মেয়ের যাওয়াও বন্ধ হলো।

মেয়েটি ছবি আঁকতে ও কাপড়ের ওপর তুলির কাজ করতে পারতো। চীরিব্‌ল্‌ ভাইরা নিকোলাসকে মেয়েটির বাড়ি পাঠালেন ছবি কেনার ছলে তাকে সাহায্য করতে।

পরদিন সকালে নিকোলাস তাদের বাড়িতে গেল। এক অখ্যাত পল্লীর ভেতর সারিবদ্ধ কয়েকটা ছোট বাড়ি। একটা বাড়ির ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভেতরে ছোট্ট বাগান। বহুদিনের অবহেলায় আর অযত্নে ধুলো জমে আছে। হাওয়ায় সেই ধুলো চারদিকে উড়ছে।

ভাঙাচোরা লোহার গেটটা আস্তে আস্তে ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো। দরজায় কড়া নাড়তেই একজন মহিলা এসে তাকে ওপরে নিয়ে গেল।

ঘরের একদিকে ম্যাডেলিন বসে আছে। তার সামনে একটা টেবিল—তার ওপর ছবি আঁকার জিনিস। ম্যাডেলিনের বাবা অন্যদিকে চেয়ারে বসে। পঞ্চাশের বেশী বয়েস নয়। মুখের চামড়া কুঞ্চিত। দেখলে মনে হয় এক রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ।

নিকোলাস টেবিলের ওপর পাঁচ পাউণ্ড রেখে কিছু কাজের অর্ডার দিলো। তার বাবা সেটা গুণে নিয়ে রসিদ দিতে বললেন। নিকোলাস রসিদের দরকার নেই জানাতে তার বাবা জানালেন—আমার মেয়ে কারো কাছ থেকে অনুগ্রহ চায় না। সে তোমারই হোক বা অন্যেরই হোক।

এই সামান্য অর্থে যে বেশিদিন চলবে না সেটা তার বাবাই তাকে জানিয়ে দিলেন। আবার পরের সপ্তাহেই আসবার জন্যে তাকে বললেন।

এদিকে র‍্যালফের অফিসে পঁচাত্তর বছরের এক বুড়ো এসে হাজির। নাম তার আর্থার গ্রাইড। র‍্যালফকে জানালো সে ম্যাডেলিনকে বিয়ে করতে চায়। তাকে বিয়ে করলে সে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হবে। সেই সম্পত্তির হদিশ সে ছাড়া আর কেউ জানে না। একমাত্র র‍্যালফের সাহায্য ছাড়া এ বিয়ে সম্ভব নয়। অবশ্য এজন্যে র‍্যালফের সঙ্গে একটা চুক্তি করলো।

র‍্যালফের কাছে ম্যাডেলিনের বাবার অনেক ঋণ আছে। সে সব তাকে আর্থার শোধ করে দেবে। শুধু তাই নয়, আরো পাঁচ হাজার পাউণ্ড সে র‍্যালফকে দেবে। এই অর্থ বিয়ের আগেই তাকে দেওয়া হবে।

র‍্যালফ রাজি হলেন।

তারা দুজনে ম্যাডেলিনের বাড়িতে গেলেন। ম্যাডেলিনের বাবাকে র‍্যালফ অনেক বোঝালেন। তাকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হবে। বাকী জীবনটা সে ফ্রান্সে গিয়ে আরামে কাটাতে পারবে। ঋণের বোঝাও তার কাঁধে থাকবে না। এখন যেটা আসল প্রয়োজন সেটা হলো ম্যাডেলিনকে বিয়েতে রাজী করানো।

ম্যাডেলিনের বাবা এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না। তাদের কাছে এক সপ্তাহের সময় চেয়ে নিলো।

১২

স্মাইকের শরীর দিন দিনই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার তাকে দেখে বললেন সে ক্ষয়রোগে ভুগছে। তার এখন বায়ু পরিবর্তনের দরকার। কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় তার যাওয়া উচিত।

নিকোলাসের মনিবেরা সে কথা শুনে তার বাইরে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন!

নিকোলাস ও স্মাইক ডেভনশায়ারে গিয়ে বাস করতে লাগলো। সেখানে স্মাইক বেশ ভালই ছিল। একসঙ্গে তারা ঘুরে বেড়াতো। যেখানে নিকোলাসের ছেলেবেলা কেটেছে সে সব জায়গা স্মাইককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতো।

হঠাৎ তার শরীর ভেঙে পড়লো। একদিন সে নিকোলাসকে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো। যখন সে মরে যাবে তখন যেন তাকে নিকোলাসের বাবার সমাধির পাশেই কবর দেওয়া হয়।

একদিন নিকোলাসের গলা জড়িয়ে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—আজ আমার শেষদিন, কিন্তু মরতে আমি ভয় পাই না। ধীরে ধীরে তারই কোলে সে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লো। শেষ হলো এক বিড়ম্বিত জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণাময় অধ্যায়।

স্মাইককে হারিয়ে অনেক দুঃখের বোঝা নিয়ে নিকোলাস বাড়িতে ফিরে এলো। স্মাইকের মৃত্যুসংবাদ সকলকেই শোকে অভিভূত করলো।

১৩

র‍্যালফের অফিসে যখন গ্রাইডের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তখন নিউম্যান ঘরের মধ্যে লুকিয়ে সব শুনেছিল। কিন্তু এর সঙ্গে নিকোলাসের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারেনি।

নিকোলাসের সঙ্গে দেখা হ'লে নিউম্যান ম্যাডেলিনের বিয়ের ব্যাপারে তার কাকার ষড়যন্ত্রের কথা জানালো। সে কথা শুনে নিকোলাস বিস্মিত ও রাগান্বিত হয়ে উঠলো। তার মনিবরা তখন বাইরে। কি করে ম্যাডেলিনকে সে এ দুরবস্থার হাত থেকে বাঁচাবে কিছুই ভেবে পেল না।

কোন আশা নেই—হতাশ স্বরে নিকোলাস জানালো।

সত্যিই কি নেই? চিন্তা করো—উৎসাহ দিয়ে নিউম্যান বললো।

হ্যাঁ, একটা পথই আছে। আর কালই আমি সেই চেষ্টা করবো—ম্যাডেলিনের সাহসের কথা ভেবেই নিকোলাস জানালো।

পেগ-এর বাড়িতে স্কুইয়ার্স কাগজ পড়ে দেখছে। পেছনে ক্র্যাঙ্ক, লাঠি হাতে নিউম্যান।

কি সেটা ?—আগ্রহভরে নিউম্যান শুধালো।

মেয়ের সঙ্গে আমি দেখা করবো। মনিবরা থাকলে যা করতেন, আমি তাই করবো। এই বিয়ে না করার জন্যে আমি তাকে অনুরোধ করবো।

ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ—সোৎসাহে নিউম্যান বলে উঠলো।

বিয়ের আর মাত্র দু'দিন বাকি। তার কাকার এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে ফুলের মত একটা সুন্দর জীবন নষ্ট হতে চলেছে! এই ভাবনায় তার রাতের ঘুম চলে গেল।

সকাল হতেই নিকোলাস ম্যাডেলিনের বাড়িতে গেল। ওপরে উঠে তাদের ঘরে গিয়ে দেখলো ম্যাডেলিন ও তার বাবা বসে আছে।

ম্যাডেলিনের চেহারা একদিনে এত বদলে গেছে যে তাকে দেখলে চেনাই যায় না। রোগা ফ্যাকাশে চিন্তাভারাক্রান্ত মুখ।

আপনার মনিবকে বলবেন আমার মেয়ে তার কোন কাজ আর করবেনা। তার অর্থেরও আমাদের আর দরকার নেই।। সে জাহান্নমে যাক্।—নিকোলাসকে দেখে তার বাবা বললো।

আমি কোন কাজ দিতে আসিনি। আমার মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেটা আর কিছুই নয়—আপনার মেয়ে রোজগার করে আপনার খরচ যোগাতো। আপনি এখন তাকে আরো বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন—বেশ চিৎকার করে রাগত স্বরে কথাগুলো বললো নিকোলাস।

ম্যাডেলিনের বাবা তার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। সে একা থাকতে চাইলো। বাইরে এসে ম্যাডেলিনকে এ বিয়েতে মত না দেওয়ার জন্যে বোঝাতে চেষ্টা করলো নিকোলাস। সে এই বদমাশ লোক দু'জনকে বেশ ভালো করেই জানে। টাকার জন্যে বাবা তাকে বিক্রি করতে চলেছে।

এক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী সে হবে যা এখনো তার জানা নেই। সে অর্থ পেলে বিয়ে না করেও তার বাবাকে সে রক্ষা করতে পারবে। এক সপ্তাহ সময় পেলে সে সব কিছু ঠিক করে নিতে পারবে। তার এ বদান্যতার জন্যে ম্যাডেলিন তাকে ধন্যবাদ জানালো। কিন্তু তার অনুরোধ সে রক্ষা করতে পারবে না। সে জানালো বাবার প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে আর সেজন্যেই তাকে বিয়ে করতে হবে।

১৪

হতাশ না হয়ে নিকোলাস সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা গেল গ্রাইডের বাড়িতে। গ্রাইড তখন একটা নোংরা ও অন্ধকার ঘরে বসে বিয়ের কথা ভেবে মনে মনে পুলকিত হচ্ছিল। তারপর সে একমনে খাতায় অর্থের হিসেব করছিলো। হঠাৎ মুখ তুলে দেখলো সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে। চোর, চোর! বলে ভয়ে সে চিৎকার করে উঠলো।

আমি চোর নই। তোমার নাম ধরে কয়েকবার ডেকেছি কিন্তু কোন সাড়া পাইনি। তাই সোজা চলে এসেছি এখানে—নিকোলাস বললো।

কে তুমি ?—

সে জেনে তোমার কোন দরকার নেই। তুমি কাল বিয়ে করতে যাচ্ছ ?

তুমি কি করে জানলে ?

তা জানতে হবে না। মহিলাটি তোমায় ঘৃণা করে। কিন্তু তুমি আর র‍্যালক নিকলেবি এ বিয়ের ব্যবস্থা করেছ। আর তাকে প্রচুর পারিশ্রমিকও দেবে।

আর্থার কোন কথা বললো না। নিকোলাস বলে চললো—

তুমি এর জন্যে পরে আফশোষ করবে। আমি

একা নই—আমরা আসল উদ্দেশ্য বার করবোই। এ বিপদ থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা করো। বলতো, তুমি কত টাকা পেলে এ বিয়ে করবে না?

গ্রাইড প্রথমে ভেবেছিল লোকটি তাকে ছলনা করতে এসেছে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলো সে আসল ব্যাপার কিছুই জানে না। তাই সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে খোলা জানালার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো—সাহায্য করো। কে আছো, আমায় সাহায্য করো।

নিকোলাস তাকে জানালা থেকে টেনে নিয়ে এলো। তুমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, আমি লোক ডেকে তোমাকে চোর বলে ধরিয়ে দেব—কুটিল হাস্যে আর্থার বললো।

নিকোলাস বুঝলো ভয় দেখিয়ে কোন কাজ হবে না। ঘৃণায় সেখান থেকে সে বেরিয়ে গেল।

১৫

বিয়ের দিন সকালবেলা আর্থার সেজেগুজে র‍্যালফকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাডেলিনের বাড়িতে গেল। সেখানে তাদের কেউ স্বাগত জানাতে এলো না। তাঁরা চোরের মত চুপি চুপি ওপরে উঠলেন।

একটা ঘর থেকে মিঃ ব্রে বেরিয়ে এলো। জানালো ম্যাডেলিন এখুনি তাদের সামনে এসে উপস্থিত হবে। আবার ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ আর জামাকাপড়ের খসখসানি আওয়াজ শোনা গেল।

গ্রাইড তাড়াতাড়ি স্মিতহাস্যমুখে মাথা নিচু করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু একি। দরজা খুলে বাইরে যারা এলো তাদের দেখে র‍্যালফ বিস্মিত হলেন। ভয়ে তিনি দু'পা পিছিয়ে গেলেন। রাগে আর ক্ষোভে তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না।

তোমাদের হাত থেকে মিস্ ব্রেকে রক্ষা করতে আমি এখানে এসেছি। যে পর্যন্ত না সেটা হয়, আমি এখানেই থাকবো—নিচু স্বরে জানালো নিকোলাস।

এই লোকটাই কাল আমার বাড়িতে গেছলো! —ফিসফিসিয়ে বললেন গ্রাইড।

গ্রাইড, তুমি মিঃ ব্রেকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো —আদেশ করলেন র‍্যালফ।

ধড়ে যদি আপনার মাথাটা রাখতে চান, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকুন—নির্লিপ্তভাবে নিকোলাস গ্রাইডকে জানালো।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে গ্রাইড আর এগোতে

ডোথবয়েজ হল-এ ছেলেদের উল্লাস। মিসেস স্কুইয়ার্সকে 'ওষুধ' খাওয়ানো হচ্ছে।

সাহস পেলেন না।

র‍্যালফ নিজেই তখন কেটিকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে যাবার চেষ্টা করলেন।

নিকোলাস তার বোনের প্রতি এমন অসভ্য আচরণ সহ্য করতে পারলো না। রাগের মাথায় সে র‍্যালফের জামার কলার চেপে ধরলো।

ঠিক সেই সময়ে অন্য ঘরের মেঝেতে ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ উঠলো।

নিকোলাস ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলো ব্রে মাটিতে পড়ে রয়েছে। দেহে কোন প্রাণ নেই। ম্যাডেলিন দেহটাকে জড়িয়ে ধরে পিতৃশোকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

নিকোলাস তার বোনকে সঙ্গে করে ম্যাডেলিনের জ্ঞানহীন দেহটাকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এলো। সে তার পরিচারিকাকে একটা গাড়ি আনতে বললো।

তাদের দেখে র‍্যালফ ও গ্রাইড স্তম্ভিত ও বাকশূন্য হয়ে গেলেন। কি করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। ম্যাডেলিনকে নিয়ে নিকোলাস বেরিয়ে যেতে গেলে র‍্যালফ তাকে বাধা দিলেন।—তুমি ম্যাডেলিনকে নিয়ে যেতে পার না।

আপনি বলার কে—নিকোলাস ব্যঙ্গ করলো। তারপর বললো—আজ বারোটায় গ্রাইড যে টাকা দেবে বলেছিলেন সেটা আর পাচ্ছেন না। সব মতলবই আপনার ফেঁসে গেল। শুধু তাই নয়, এক ধাক্কায় আজ আপনি দশ হাজার পাউণ্ড খোয়ালেন।

না-না-না। এ সত্যি নয়—চিৎকার করে র‍্যালফ বলে উঠলেন।

সে আপনি দেখতেই পাবেন—এই বলে নিকোলাস ম্যাডেলিনকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। কেউই তাকে বাধা দিতে সাহস পেল না।

১৬

র‍্যালফ ও গ্রাইড ক্ষুণ্ণমনে ম্যাডেলিনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চ'ড়ে বসলেন। নিকোলাসের কথা চিন্তা করতেই র‍্যালফ অস্থির হয়ে উঠছেন। দশ হাজার পাউণ্ড ক্ষতি। তার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার ব্যবসায় যে অর্থ লাগিয়েছি তা' সব গেল! হায়! হায়! সে কিনা আমাকে এই খবর দিল!

ইতিমধ্যে তাঁরা আর্থারের বাড়ি এসে পৌছলেন। বারবার দরজায় ঘণ্টা বাজাতেও কেউ এলো না। শেষে তারা বাড়ির পেছন দিকের দেওয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলেন! সব ঘর অন্ধকার। গৃহরক্ষিকা পেগকে কোথাও পাওয়া গেল না। তাঁরা গ্রাইডের ঘরে বসলেন।

এই দেখ, তোমার সই করা কাগজ ছিঁড়ে ফেলছি। এটা আর আমাদের কোন কাজে লাগবে না—হতাশ ভাবে বললেন র‍্যালফ।

সন্দিগ্ধ মনে এতক্ষণ গ্রাইড ঘরের চারদিক লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ চিৎকার করে একটা স্যুটকেশের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন।

কি হলো?—জিজ্ঞেস করলেন র‍্যালফ।

চুরি গেছে! চুরি গেছে! আর্থার বলে উঠলেন।

কি চুরি গেছে? টাকাকড়ি?

না-না-না! আরো আরো বেশি ক্ষতি!

কি হারিয়েছে?

কাগজ—দলিল! আমার সর্বস্ব গেল! পেগ দেখেছিলো বাক্সের মধ্যে কাগজগুলো রাখতে—সেই বাক্সটাই লোপাট!

র‍্যালফ বুঝতে পারলেন গ্রাইডের চুরি করে আনা দলিল—যা ম্যাডেলিনকে প্রচুর সম্পদের অধি-

কারিণী করবে সেগুলি চুরি গেছে।

পেগ পড়তে পারে না। নিশ্চয়ই সে মেয়েটার কাছে কাগজগুলো নিয়ে গেছে।

গ্রাইডের আশঙ্কা হলো এবার তার চুরি ধরা পড়বে। তার ভাগ্যে জুটবে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা।

পেগ নিশ্চয়ই বেশি দূর যায়নি। আমি পুলিস ডাকছি।

খবরদার! ও করবেন না—তাহলে আমাকে জেলে পচে মরতে হবে—চিৎকার করে উঠলেন গ্রাইড।

র‍্যালফ কোন কথা না বলে সেখান থেকে নিজের বাড়ি চলে এলেন।

নিকোলাসের কথা তখনো তার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। দশ হাজার পাউণ্ড! কত বছর ধরে আমি এই অর্থ জমিয়েছি। আমার ক্ষতির কথা আমাকে বলতে তার কি আনন্দ। তাকে যদি উচিত শিক্ষা দিতে পারি তবেই আমার সন্তুষ্টি—রাগের জ্বালায় র‍্যালফ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি নিউম্যানকে একটা চিঠি দিয়ে স্কুইয়ার্সকে ডেকে পাঠালেন। স্কুইয়ার্স এলে তার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে লাগলেন র‍্যালফ।

গ্রাইডের বিয়ে ভেঙে যাওয়া থেকে দলিল চুরি পর্যন্ত সব ঘটনা তাকে শোনালেন। শেষে বললেন ম্যাডেলিন যদি এই দলিল পায় আর নিকোলাসকে বিয়ে করে তাহলে তারা প্রচুর অর্থ এবং ক্ষমতার অধিকারী হবে। সেই দলিলটা আমার সামনে এনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তার জন্যে অবিশ্যি তুমি ভাল পারিশ্রমিক পাবে।

স্কুইয়ার্সের প্রশংসা করে এবং নিকোলাসের বিরুদ্ধে তার মনকে বিষিয়ে তুলে তাকে উত্তেজিত করে তুললেন র‍্যালফ

নিকোলাসকে জব্দ করার এ সুযোগ স্কুইয়ার্স হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

১৭

স্কুইয়ার্স বেশ কিছুদিন ধ'রে পেগ স্লাইডারস্কিউর বাড়ির কাছে বাস করছিলেন। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আলাপও করতেন। পেগ কিন্তু তার আসল পরিচয় অথবা তার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারেনি। এক শীতের রাতে স্কুইয়ার্স পেগের ঘরে গেলেন। পেগের সঙ্গে গল্প করতে করতে তিনি গ্রাইডের বিয়ে ভাঙার ঘটনা শোনালেন। সে কথা শুনে পেগের খুব আনন্দ হলো।

তারপর স্কুইয়ার্স বললেন—তুমি যে বলেছিলে গ্রাইডের বাড়ি থেকে কাগজ এনেছ? সেগুলো যদি দেখাও তাহলে বলে দিতে পারি কোনটা রাখবে আর কোনটা পুড়িয়ে ফেলবে। পুলিসের ঝামেলা এড়ানো দরকার বুঝলে?

একটু ভেবে পেগ বললো—ঠিক আছে, তোমাকে দেখাচ্ছি।

সে উঠে গিয়ে কয়লার ভেতর থেকে একটা ছোট বাক্স বের করে স্কুইয়ার্সের পায়ের কাছে রাখলো। তারপর বালিশের তলা থেকে চাবিটা এনে তার হাতে দিলো।

বাক্স থেকে কাগজগুলো বার করে স্কুইয়ার্স বললেন প্রথমেই তুমি বাক্সটা আগুনে পোড়াও, ততক্ষণে আমি কাগজগুলো দেখি।

মোমবাতির আলোয় কাগজগুলো দেখতে লাগলেন স্কুইয়ার্স। আর পেগ বাক্সটা ভেঙে টুকরো করে আগুনে পোড়াতে লাগলো।

এমন সময় চুপিচুপি দুজন লোক ঘরে ঢুকে স্কুইয়ার্সের পেছনে দাঁড়ালো। এরা হচ্ছে ফ্রাঙ্ক চীরিব্‌ল্ ও নিউম্যান নগ্‌স্।

পেগ বদ্ধ কালা আর স্কুইয়ার্স একমনে কাগজগুলো দেখছিলেন। তাই দুজনের কেউই তাদের ঘরে ঢোকার শব্দ পায়নি।

নিউম্যানের হাতে একটা ছোট মোটা লাঠি। তার পাশে ফ্র্যাঙ্ক ঝুঁকে স্কুইয়ার্সের হাতের কাগজগুলো পড়ছে।

মাঝে মাঝে স্কুইয়ার্স পেগকে একটা করে কাগজ দিচ্ছে আর বলছে,—পুড়িয়ে ফেল।

এক সময়ে আনন্দে চাপা স্বরে বলে উঠলেন—এই যে পেয়েছি! এই সেই উইল—ম্যাডেলিনের সম্পত্তি!

উইলটা পকেটে রাখতেই নিউম্যানের লাঠিটা তাঁর মাথায় পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেঝেতে অজ্ঞান হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন।

১৮

তখন সকাল প্রায় দশটা।

র‍্যালফ নিজের ঘরে বসে আছেন। অনেকদিন স্কুইয়ার্সের কোন খবর পাননি। খোঁজ করেও তাঁর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। গ্রাইডের কাছে গিয়েও তিনি হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন।

নানা চিন্তায় তিনি মগ্ন। এমন সময় দরজায় আওয়াজ শোনা গেল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

মিঃ নিকলেবি, আমি চীরিব্‌ল্ ব্রাদার্স থেকে আসছি। একটা খারাপ সংবাদ আছে। আপনি এখুনি আমার সঙ্গে আসুন—বললো টিম লিনকিন-ওয়াটার, কোম্পানীর অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

র‍্যালফ সে কথায় কর্ণপাত না করে ভেতরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন।

টিম উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁকে যাবার জন্যে আবার বললো।

নিকলেবি কি ভেবে মন পরিবর্তন করে তার সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন।

তাঁরা এসে পৌঁছলেন চীরিবল্ ব্রাদার্সের অফিসে। ঘরে ঢুকেই র‍্যালফ বললেন—

আমি জানতে চাই, আমার ব্যাপারে নাক গলানোর আপনাদের কি অধিকার আছে?

মিঃ নিকলেবি, আমাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার কিছু না বলাই ভালো—এই বলে নেড ঘণ্টা বাজালেন।

ঘরের মধ্যে নিউম্যান ঢুকতেই র‍্যালফের মুখ শুকিয়ে গেল।

কি করে আপনারা এরকম একটা ফালতু লোককে বিশ্বাস করেন?—নিউম্যানকে দেখিয়ে র‍্যালফ বললেন।

ফালতু আপনিই আমাকে করেছেন। আপনি নিজে কি ধরনের লোক? একটা স্কুলমাস্টারের সঙ্গে কে গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল? আপনি ভাবতে পারেননি আমি সন্দেহ করতে পারি, তাই না? আমি আপনার ওপর আর অন্যেরা সেই স্কুল মাস্টারের ওপর নজর রাখতে পারি সেও ভাবেন নি, না? কে টাকার বিনিময়ে এক অল্প বয়সী মহিলাকে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ গ্রাইডের কাছে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করেছিল? সমস্ত ভদ্রতা জলাঞ্জলি দিয়ে কে নিজের ভাইঝিকে এক নীচ ও জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল? আপনিই সেই লোক। সমস্ত জগতের সামনে আপনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করার জন্যেই এঁদের কাছে আপনার সব ব্যাপার ফাঁস করে দিয়েছি। উত্তেজিত ভাবে নিউম্যান একবার চেয়ারে বসে আবার উঠে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল।

আপনারা যা বলছেন তা প্রমাণ করতে পারেন?

প্রমাণ আমাদের হাতেই আছে। স্মলি সব কিছুই

স্বীকার করেছে—বললেন চার্লস।

কে স্নলি? আমার ব্যাপারে তার কি করার আছে?—ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন র‍্যালফ।

র‍্যালফ, স্কুইয়ার্স ও স্নলি তিনজনে মিলে একটা ষড়যন্ত্র করছে সেটা নিউম্যান বুঝতে পেরেছিল। তাই প্রথমেই সে স্নলির কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কোন কথা বলেনি। পরে যখন জানতে পারলো র‍্যালফ ও স্কুইয়ার্স এক বৃদ্ধা মহিলার সন্ধান করছেন তখন গ্রাইডের পরিচারিকা পেগের নাম তার মনে এলো।

স্কুইয়ার্স পেগের বাড়ির কাছে যেখানে থাকতেন সেখানে একজন পুলিস অফিসারও থাকতো। এই পুলিস অফিসারটি প্রায়ই তাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখতো।

তারপর আর্থার গ্রাইডকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছুই জানতে পারা যায়নি। কারণ গ্রাইড জানতেন যে-কাগজ তিনি চুরি করে এনেছেন পুলিস যদি জানতে পারে তার দুঃখের শেষ থাকবে না।

অতএব কাগজটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। তাই একটা সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে পেগের বাড়ি থেকে চুরি করা দলিলসহ স্কুইয়ার্সকে গ্রেফতার করা হয়।

এ খবর পেয়ে স্নলি ভয় পেয়ে যায়। স্মাইকের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয় তা সব ফাঁস করে দেয়।

চার্লস জানালেন—আইনের হাত থেকে আমরা আপনাকে বাঁচাতে পারবো না। আপনি এখান থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যান।

যা পারেন আপনারা করুন—রাগে গজ গজ করতে করতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন র‍্যালফ।

বাড়িতে না ফিরে তিনি সোজা গেলেন থানায়। সেখানে গিয়ে দেখেন স্কুইয়ার্স হাজতে বন্দী। ঘরের এককোণে একটা বেঞ্চের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে স্কুইয়ার্স। তার মুখটা ঘোর হলদে আর নাকটা টকটকে লাল। রক্ত লাগানো একটা রুমাল তার মাথায় বাঁধা।

র‍্যালফ স্কুইয়ার্সকে ডেকে তুললেন।

অবশেষে আপনি এসেছেন?—স্কুইয়ার্স তাঁকে দেখে বললেন।

তুমি আমাকে একটা খবর দাওনি কেন? আমি কি করে জানবো তোমার কি হয়েছে?

তাতে আমার কিছুই হতো না। আমি এখানে বন্দী আর আপনি ওখানে মুক্ত।

তুমি যদি মুখ বন্ধ রাখো এরা তোমার কিছুই করবে না। শিগগীর তুমি এখান থেকে মুক্তি পাবে।

কেন আমি দলিল চুরি করেছি আর অন্য কাগজ-গুলো পুড়িয়েছি যদি বলি তাহলে এরা আমার কিছুই করবে না।

কি কাগজ তোমার কাছে আছে?—আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন র‍্যালফ।

এই সময় পুলিস অফিসার এসে তাদের কথায় বাধা দিল।

র‍্যালফ ভাবলেন স্কুইয়ার্স যদি মুখ না খোলে তাহলেই তিনি রক্ষা পাবেন। তবুও যাবার সময় স্কুইয়ার্সকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমি যদি কোন গণ্ডগোলে পড়ি তুমিও রেহাই পাবে না।

থানা থেকে র‍্যালফ বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন স্কুইয়ার্স তার বিরুদ্ধে যাবে।

১৯

পরদিন সকালে দেখা গেল র‍্যালফের বাড়ির সামনে একদল লোক। তাদের সঙ্গে বাড়ির রক্ষীও রয়েছে। তারা দরজায় বারবার ধাক্কা দিচ্ছে কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না। (শেষাংশ ২৬৬ পৃষ্ঠায়)

হীরের আংটি

মঞ্জিল সেন

পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে সঙ্কর্ষণ সমাদ্দারের আজকাল বেশ নাম-ডাক। অবশ্য গোয়েন্দা কথাটায় ওর খুব আপত্তি, ও নিজেকে বলে প্রাইভেট ইন্‌ভেস্‌টিগেটর। ওর পেশীবহুল বলিষ্ঠ অথচ সুশ্রী চেহারা সহজেই লোকের মনে বিশ্বাস যোগায়, নির্ভরতা আনে। বুদ্ধি, সাহস, শক্তি—এই তিনটে গুণই হল ওর সাফল্যের মূলধন।

চৌরঙ্গী অঞ্চলে, নিজের আপিস ঘরে বসে সঙ্কর্ষণ একটা ধাঁধা নিয়ে মেতেছিল। বিচিত্র বিচিত্র ধাঁধা সংগ্রহ ও সেগুলোর সমাধান করা ওর একটা বাতিক। ওর ধারণা এর ফলে মস্তিষ্কের কোষগুলোয় ঠিকমত নাড়াচাড়া পড়ে, ফলে সেগুলো সক্রিয় এবং সাফ দু-ই থাকে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং। সঙ্কর্ষণ একটু ভ্রূকুটি করে টেলিফোনের দিকে তাকালো, তারপর রিসিভার তুলে গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যালো।"

যে সমস্যা নিয়ে এতক্ষণ ও ডুবেছিল, তাতে বাধা পড়ায় মোটেই ও খুশী হয়নি, তাই গলায় এই অতিরিক্ত গাম্ভীর্য।

ওপাশ থেকে মেয়েলী গলা ভেসে এল, "মিঃ সমাদ্দারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

"বলছি", সঙ্কর্ষণ একই গলায় জবাব দিল।

"নমস্কার। আমি ডাঃ বি. কে. বসুর ১২ নম্বর টেম্পল রোড্‌ থেকে কথা বলছি। আমি ওঁর পুত্রবধূ···আপনি দয়া করে একবারটি আসবেন?"

"এখুনি?"

"হ্যাঁ, আমি একটা বিপদে পড়েছি, আপনার সাহায্য চাই···প্লিজ···", মহিলার কণ্ঠস্বরে যেন কাকুতি ঝরে পড়ছে।

সঙ্কর্ষণ হাতঘড়ির দিকে পলকে চোখ বুলিয়ে নিল, দুটো বাজতে দশ মিনিট। ডাঃ বি. কে. বসুর নাম কে না জানে! সার্জন হিসেবে তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি।

"আচ্ছা, আমি আসছি,' সঙ্কর্ষণ বলল।

"ধন্যবাদ।" টেলিফোনের রিসিভারের ভেতর দিয়ে যেন একটা স্পষ্ট স্বস্তির নিশ্বাস শোনা গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই সঙ্কর্ষণ টেম্পল রোডের নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। ভদ্রমহিলা বোধহয় ওর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ট্যাক্সি থামার সঙ্গে সঙ্গেই একতলার সদর দরজা খুলে গেল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সঙ্কর্ষণ এগিয়ে গেল। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে এক অল্পবয়সী, সুন্দরী বিবাহিতা মহিলা, করজোড়ে তিনি ওকে অভ্যর্থনা জানালেন!

একতলার বসবার ঘরে সঙ্কর্ষণকে বসিয়ে তিনি ওর মুখোমুখি একটি সোফায় বসলেন।

ভদ্রমহিলাকে একটু উত্তেজিত মনে হল, দু'চোখে শঙ্কার চিহ্ন। কোন রকম ভূমিকা না করেই তিনি বলতে শুরু করলেন, "দেখুন মিঃ সমাদ্দার, মাত্র দু'মাস হ'ল আমি এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছি। আমার স্বামী এক নামকরা সদাগরী অফিসের এঞ্জিনীয়ার। আমার শ্বাশুড়ী নেই, আর শ্বশুর মশায়ের নাম আশা করি আপনি শুনেছেন। তাঁর যেমন খ্যাতি, তেমন রাশভারী লোক তিনি। আমার স্বামীও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলেন, মুখ তুলে কথা বলতে পর্যন্ত সাহস করেন না।

"আমার বিয়েতে শ্বশুর মশায় আমাকে একটা হীরের আংটি দিয়েছেন। আসলে ওটা ছিল আমার শ্বাশুড়ীর, স্মৃতিচিহ্ন বলে শ্বশুরমশায়ের খুব আদরের জিনিস। আমাকে সব সময় আঙুলে পরে থাকতে বলেছেন। আজ সকাল থেকে ওটা পাচ্ছিনা। আঙুল খালি থাকলে শ্বশুরমশায়ের চোখে পড়বেই। চুরি গেছে কিংবা হারিয়ে ফেলেছি শুনলে তিনি ভীষণ রাগ করবেন, খুব রাগী মানুষ। আমার স্বামীকেও আংটিটা হারাবার কথা আমি বলিনি। তিনি আবার একটু ঠাণ্ডা মানুষ, বাবা রাগারাগি করবেন ভেবে হয়তো মুষড়ে পড়বেন। বাড়িতে এখন কেউ নেই। চাকর, ঠাকুর দুজনেই কাজ-কর্ম সেরে বেরিয়েছে। এই ফাঁকে আমি আপনাকে ফোন করেছি, যদি আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন। বুঝতেই পারছেন আমি নতুন বউ, আমার ভীষণ ভয় করছে।"

সত্যিই ভদ্রমহিলকে দেখলে মায়া হয়, শ্বশুর মশায়ের গঞ্জনার ভয়ে মুষড়ে পড়েছেন।

"আংটিটা কি আপনি শোবার আগে খুলে রাখেন," সঙ্কর্ষণ প্রশ্ন করল।

"না, ওটা আমার আঙুলেই থাকে," ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, "কিন্তু কাল রাত্তিরে আঙুলটা ব্যথা করছিল, তাই শোবার আগে খুলে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম।"

"কখন টের পেলেন যে ওটা নেই?"

"ভোর বেলা আমি একবার উঠেছিলাম। আমাদের শোবার ঘরের লাগোয়া বাথ্‌রুম। ফিরে এসে আবার শুয়েছিলাম, একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। আবার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন টেবিলের ওপর আংটিটাকে দেখতে পেলাম না। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু···!"

"আপনার স্বামী মজা করার জন্য লুকিয়ে রাখেননি তো?"

"না, উনি অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন, আজ সকালেই ফিরেছেন। তার আগেই আমি উঠে পড়েছিলাম।"

"প্রথমবার যখন উঠে বাথ্‌রুমে গিয়েছিলেন, তখন দরজা খুলে···মানে শোবার ঘর থেকে বাইরে যাবার দরজা খুলে রাখেননি তো?"

"না।"

"ঠাকুর, চাকর বিশ্বাসী?"

"আমার স্বামী শুনেছি ওদের কোলে পিঠেই মানুষ হয়েছেন। অনেক দিনের পুরনো আর বিশ্বাসী। তাছাড়া, ঘর বন্ধ ছিল, তাদের কারু পক্ষে আমার শোবার ঘরে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না।"

"হুঁ! যে টেবিলের ওপর আংটিটা ছিল, সেটা কি জানালার ধারে?"

"হ্যাঁ, জানালার ধারে, আবার খাটের মাথার কাছেও বলতে পারেন।"

"চলুনতো, ঘরটা একবার দেখব।"

ভদ্রমহিলার পেছন পেছন সঙ্কর্ষণ দোতলায় উঠে এল। বেশ বড় ঘর, পুরনো আমলের তাই দৈর্ঘ প্রস্থ দুদিকেই প্রশস্ত। জানালার ধারে একটা বড় খাট। মাথার কাছে একটা গোল শ্বেত-পাথরের টেবিলে টুকি-টাকি জিনিস। ওই টেবিলের ওপরেই ছিল আংটিটা।

ঘরের চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে সঙ্কর্ষণ প্রশ্ন করল, "আপনার যখন দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙ্গল, তখন ঘর থেকে বেরুবার দরজাটা বন্ধ ছিল, এ বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই তো?"

"না।"

ঘরের খিল দেওয়া ছিল?

"হ্যাঁ। প্রথমবার যখন উঠি তখন খুব ভোর, চোখেও ঘুম ছিল, তাই দরজা খুলিনি।"

ঘরে সবশুদ্ধ চারটে জানালা।

সঙ্কর্ষণ খাটের পাশের জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল। লোহার গরাদ দেওয়া সাবেকী আমলের জানালা।

"ঘরের সব জানালাই কি রাত্তিরে খোলা ছিল?" জানালা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে সঙ্কর্ষণ জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ", ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, "জানালা বন্ধ করে আমি শুতে পারি না, মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসে।"

সঙ্কর্ষণ দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কারো পক্ষে আংটিটা সরানো সম্ভব নয়, কারণ চোর যে বেয়ে উঠবে এমন কোনো পাইপ ওই জানালার পাশ দিয়ে যায়নি। তা ছাড়া কার্নিশটাও এমন চওড়া নয় যে, তার ওপর দিয়ে কেউ হাঁটতে পারে। এদিকে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, সুতরাং চাকর-ঠাকুরের পক্ষেও ঘরে ঢুকে ওটা চুরি করার পথ নেই। ব্যাপারটা সঙ্কর্ষণের কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকল।

জানালাটার কয়েক হাত দূরেই একটা কাঠ-গোলাপের গাছ। ওটার ওপর থেকে আঁকশি মত কিছু জানালা দিয়ে গলিয়ে আংটিটা বের করে নেয়া সম্ভব কি? সঙ্কর্ষণ ভুরু কুঁচকালো। তা যদি সম্ভবও হয়, চোর জানবে কেমন করে যে ওই রাত্তিরেই ভদ্রমহিলা টেবিলের ওপর ওটা রাখবেন! তা ছাড়া চোর নিশ্চয়ই সকালবেলা অর্থাৎ ভদ্রমহিলা ঘুম থেকে ওঠার আগে গাছের ওপর উঠে ও কর্মটি করেনি। তা করলে কেউ না কেউ দেখে ফেলত। রাস্তার জমাদার, আশে-পাশের বাড়ির মানুষ, ভোরে যাদের কাজ শুরু হয় এমন সব লোকের চোখে পড়ত ব্যাপারটা। রাতের অন্ধকারে আংটিটা চোখেই পড়বেনা। অবশ্য গাছটাও জানালার একেবারে ধার ঘেঁসে নয়, দিনের আলোতেও ওটার একটা ডালে বসে আংটির মত ছোট্ট একটা জিনিস বের করে আনা রীতিমত কসরতের দরকার, অসাধ্যও বলা চলে। সঙ্কর্ষণ দু'পাশে মাথা নাড়ল। না, ওভাবে আংটিটা সরানো প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।

একটা কাক ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর হাব-ভাব লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সেটা তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল। ভদ্রমহিলাই বললেন, "এই কাকগুলির যন্ত্রণায় ঘরে টেঁকা মুস্কিল। গাছের ডালে বাসা করেছে, আর জানালার ধারে এলেই মনে করে আমরা বোধহয় ওর বাসা ভাঙ্গার মতলব করছি। সারা দিন কাঁ কাঁ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।"

সঙ্কর্ষণ মৃদু হেসে বলল, "চাকর বাকরদের বললেই তো পারেন, বাসাটা ভেঙ্গে দেবে।"

"ডিম পাড়বে বলে বাসা বেঁধেছে," ভদ্রমহিলা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন।

সঙ্কর্ষণ আবার ঘরের দিকে চোখ ফেরালো। হঠাৎ দেয়ালের একজায়গায় চোখ পড়তেই ওর কপাল কুঁচকে গেল। দেয়ালে একটা ছোট গোল আলো পড়েছে। সূর্যের আলোয় আয়না কিংবা কাচ ধরলে যেমন আলোর প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়ে ঠিক তেমন। কোনো বাড়ি থেকে কেউ এ ঘরে আলো ফেলে অসভ্যতা করছে নাকি! কোন্ বাড়ি থেকে? কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আশে-পাশের বাড়িতে অপরাধীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

সঙ্কর্ষণ ঠোঁট কামড়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল, মুখ চিন্তা-কুটিল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ওর দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একটা সম্ভাবনা মাথায় ঝিলিক খেলেছে। ফিরে দাঁড়িয়ে ও বলল, "আপনাদের বাড়িতে ঘরের ময়লা ঝাড়ার লম্বা ঝুল-ঝাড়ন আছে?"

ভদ্রমহিলা ওর প্রশ্নে একটু অবাকই হলেন, বললেন, "আছে, কি হবে?"

"চট্ করে নিয়ে আসুনতো", সঙ্কর্ষণ বলল।

ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট-খানেক বাদেই ফিরে এলেন, হাতে সরু বাঁশের একটা লম্বা ঝুল-ঝাড়ন।

সঙ্কর্ষণ জানালার কাছে গিয়ে সেটা দিয়ে গাছের ডালে সদ্য বানানো কাকের বাসাটা ভাঙ্গতে লাগল।

ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "এ কি! ওটা ভাঙ্গছেন কেন?"

"দেখুন না কেন ভাঙ্গছি," তাক্ করে খোঁচা মারতে মারতে জবাব দিল সঙ্কর্ষণ।

কাক দুটো তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, ওদের সঙ্গে আরো কয়েকটা এসে যোগ দিল, সঙ্কর্ষণের ভ্রূক্ষেপ নেই। বাসাটা যতই সে ভাঙ্গছে, ওটা থেকে সঞ্চিত টুকিটাকি জিনিস টুপ টুপ করে পড়ছে মাটিতে। ইলেকট্রিক তার থেকে শুরু করে রাজ্যের জিনিস জড়ো করেছে কাক দুটো ওদের বাসায়।

সঙ্কর্ষণ নীচে নেমে গেল। কাঠগোলাপ গাছটার তলায় গিয়ে ঝরে পড়া জিনিসগুলো থেকে একটা কিছু সাবধানে তুলে আবার উঠে এল ওপরে। ভদ্রমহিলার হাতে জিনিসটা দিয়ে বলল, "এই নিন আপনার আংটি।"

* * *

বসবার ঘরে ওরা এসে বসেছে। হারানো মাণিক ফিরে পাবার মতই ভদ্রমহিলার মুখ খুশীতে ডগমগ। হাসিভরা মুখে তিনি বললেন, "সত্যি, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব! আমি তো ভয়েই মরছি, এদিকে আংটিটা চুরি করেছে একটা কাক! কিন্তু আপনি কি করে বুঝতে পারলেন?"

সঙ্কর্ষণ হাসল, বলল, "প্রথমে আমিও বুঝতে পারিনি। দেয়ালে আলো ঠিকরোচ্ছে দেখে মনে করেছিলাম বোধহয় কোন দুষ্টু লোক সূর্যের

আলোয় কাচ কিংবা আয়নার রিফ্লেকশন আপনার ঘরে ফেলছে। সেটা লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলাম কাকের মুখে একটা তার। তখুনি সব সমাধান হয়ে গেল। গাছটা রয়েছে আপনার ঘরের পশ্চিম দিকে। এখন বেলা প্রায় তিনটে, সূর্যও পশ্চিমে হেলেছে। সেই সূর্যের আলো কাকের চুরি করা হীরের আংটির ওপর পড়ায় আলো ঠিকরে জানালার ভেতর দিয়ে উল্টো দিকের দেয়ালে পড়েছে। কাক যখন বাসা তৈরি করে তখন সে মস্ত চোর হয়ে ওঠে। জিনিসের বাছ্-বিচার নেই, যা পাবে তাই চুরি করবে। একবার এক কাকের বাসা থেকে এক ভদ্রলোকের চশমা পাওয়া গিয়েছিল, সেই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। আপনার টেবিলটা জানালার কাছেই, গাছটাও দূরে নয়। তাই কাকের পক্ষে আংটিটা চুরি করতে বেগ পেতে হয়নি। আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, মানে খুব ভোরেই তখুনি নিশ্চয়ই ওটা সরিয়েছে কাক চোর। হীরের আংটির কদর পাখীও বোঝে, এবার থেকে সাবধান হবেন।"

ওর কথার ভঙ্গীতে ভদ্রমহিলা মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

(২৬১ পৃষ্ঠার পর)

তখন দু-তিন জন লোক বাড়ির পেছন দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তারা একতলায় কোন ঘরেই কাউকে দেখতে পেল না। ছাদের ওপর একটা ছোট ঘর ছিল। সেখানে গিয়ে দেখলো দরজা বন্ধ।

তাদের মধ্যে একজন দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলে যেতেই লোকটা চিৎকার করে বলে উঠলো—দেখ, দেখ! দরজার পাশে লুকিয়ে রয়েছে।

সকলে হুড়মুড় করে দরজার সামনে এগিয়ে গেল। দেখা গেল ঘরের ছাদ থেকে একটা দড়ি ঝুলছে। একজন লোক হঠাৎ পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে ঘরে ঢুকে দড়িটার কাছে গেল।

বিস্মিত হয়ে দেখলো—র‍্যালফ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে!

এদিকে স্কুইয়ার্সের জেলে বন্দী হওয়ার খবর ডোথবয়েজ হলে গিয়ে পৌঁছলো। সে কথা শুনে ছেলেরা উল্লাসে বেপরোয়া হয়ে উঠলো।

নিয়মমাফিক সেদিন সকালে মিসেস্ স্কুইয়ার্স কাঠের চামচ আর বাটিতে সেই ওষুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে তাঁর ছেলে ও মেয়ে।

ঘরে ঢুকতেই ছেলেরা একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো। একজন দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। আর একজন তাঁর হাত থেকে কাঠের চামচ ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে হাঁটুগেড়ে মাটিতে বসতে আদেশ করলো। তারপর বাটি থেকে সেই ওষুধ এক হাতা নিলো। অন্য ছেলেরা জোর করে তার মুখে চামচ ঢুকিয়ে সেই ওষুধ ঢেলে দিয়ে মুখ চেপে ধরলো।

আর একদল তাঁর ছেলেকে ধরে তার মাথাটা একটা টবের মধ্যে ঢুকিয়ে চেপে ধরে রইলো। মেয়েটাকে একদল মারতে লাগলো।

হুর্‌রে, হুর্‌রে—বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো তারা। লাফালাফি আর ভাঙাভাঙি করে তারা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলো।

তারা এখন মুক্ত—যে যেদিকে ইচ্ছে ছুটে পালালো। ডোথবয়েজ হল শূন্য—ক্রমে তার কথা সকলে ভুলে গেল।

.....গুপ্তধন রহস্য.....

স্বপ্নে দেখা

আর্থিক বিপর্যয়ের চাপে মানুষের মন যখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন অনেকেই বিপর্যয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ আবিষ্কারে কল্পনার আশ্রয় নেয় —স্বপ্ন দেখে রাশি রাশি টাকা, কুবেরের ঐশ্বর্য তার করায়ত্ত হয়েছে। পাওনাদারদের দাবী মিটিয়েও তার হাতে যা থেকে যাবে তাতে তার সারা জীবন সচ্ছলভাবে চলে যাবে। এইসব স্বপ্ন অনেক-সময় উদ্ভট, অবাস্তব আকারে মানস চক্ষে দেখা দেয়— যেমন দেখেছিল আমার বন্ধু, ভাগ্য-বিড়ম্বিত উইলিয়াম লেগ্রাণ্ড। স্বপ্নটা এই—লেগ্রাণ্ড ঘরের মধ্যে বসে আকাশ পাতাল ভাবছে। পশ্চিম আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ উঠেছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে!...কালো মেঘটা ক্রমে জমাট বাঁধতে লাগল। লেগ্রাণ্ড দেখছে মেঘটা একটা নর-কঙ্কালের রূপ নিয়েছে। তার হাতে সাবেক দিনের পাল তোলা একটা বড় জাহাজ। জাহাজের মাস্তুলে একটা কালো পতাকা।... আরও এগিয়ে আসতে লেগ্রাণ্ড দেখল পতাকায় জলদস্যুদের কুখ্যাত প্রতীক, 'স্কাল অ্যাণ্ড ক্রসবোন'—একটা খুলি, আর আড়াআড়ি ভাবে ক্রস চিহ্নের মতন রাখা দুটো হাড়!....হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেটা এসে থামল একটা ভূখণ্ডে। লেগ্রাণ্ড দেখে স্থানটি সমুদ্রে ঘেরা একটা দ্বীপ। লেগ্রাণ্ড-এর মনে হল, দ্বীপটি যেন তার চেনা।....তারপর-ই সব মিলিয়ে গেল!...

সালিভান দ্বীপে লেগ্রাণ্ড

এ কাহিনী আমার বন্ধু লেগ্রাণ্ড-এর কাহিনী— উদ্ভট অবাস্তব একটা স্বপ্ন তার ক্ষেত্রে কি করে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল, তারই আশ্চর্যজনক কাহিনী! সে কাহিনী অবশ্য আমি অনেক পরে শুনেছি!

সালিভানের দ্বীপ

লেগ্রাণ্ডদের অবস্থা এককালে খুবই ভাল ছিল। অভিজাত ধনী পরিবার বললে ভুল হবে না। কলসির জল গড়িয়ে খেতে খেতে এক সময়ে ফুরিয়ে যায়—ওদের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা ঘটেনি অবশ্য। বিশ্বব্যাপী মন্দার ধাক্কা ওদের পরিবারের ওপরও এসে পড়েছিল। বিপর্যয়ের ঝড় ঝাপটা কেটে

গেলে, পরিবারের শেষ পুরুষ অবিবাহিত লেগ্রাণ্ড উপলব্ধি করল, বাকি যা রইল তা দিয়ে পুরনো ঠাট বজায় রেখে বড়মানুষি করতে যাওয়া চূড়ান্ত বোকামি হবে। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে হবে। আয় কমে গেছে, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা রেখে উড়তে গেলে তার চলবে না।....

ভেবে চিন্তে লেগ্রাণ্ড ঠিক করলে সে কিছুদিনের জন্যে নির্জন-বাস করবে, পরিচিত লোকদের, আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গ বর্জন করে।

তারপর শুরু হল, বাসের উপযোগী আস্তানা খোঁজার। ঘুরতে ঘুরতে লেগ্রাণ্ড এসে হাজির হল দক্ষিণ ক্যারোলিনার পূর্বপ্রান্তে! একটা গিরি খাতের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে এক স্রোতোস্বিনী —জলা, জঙ্গলের আগাছার ভিতর দিয়ে। খাতের ওপারে সালিভান দ্বীপ—প্রায় তিন মাইল লম্বা, সওয়া মাইল চওড়া! দ্বীপের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর।

লেগ্রাণ্ড থমকে দাঁড়াল, চোখ কচলে নিয়ে আবার ভাল করে দেখলো!....একি দেখছে সে? এযে সেই স্বপ্নে দেখা দ্বীপ—যেখানে মেঘের পিঠে চড়ে ভাসতে ভাসতে কঙ্কালটা এসে থেমেছিল—তারপর মিলিয়ে গিয়েছিল।

প্রায় সারা দ্বীপ জুড়ে বালির আস্তরণ। মাঝে মধ্যে দু'একটা ঢিবি, যেগুলি ঠিক পাহাড় আখ্যার উপযোগী নয়। এখানে সেখানে কাঁটা ঝোপ। আর আছে মার্টল গাছ, যার সুগন্ধ বাতাসকে আমোদিত করে রেখেছে। নীরস বালির মধ্যেও গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে। গুঁড়ি বেশ মোটা, উচ্চতা পনের থেকে কুড়ি ফুট।

দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজ্যের দিকে মৌলট্রি ফোর্ট - নিছক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই বোধ হয় এখানে এই দুর্গ স্থাপন করা হয়েছে। দুর্গের আশে-পাশে দু'একটা কুটির—বড় লোকদের গ্রীষ্মকালীন প্রমোদ-নিবাস বলে মনে হয়। বাকি অংশে জন-মানবের চিহ্ন নেই।

উইলিয়াম লেগ্রাণ্ড ও তার সাথী জুপিটার

লেগ্রাণ্ডের সঙ্গে এসেছিল, তার ভৃত্য ও সাথী জুপিটার। নিগ্রো জুপিটার ছিল এই পরিবারের ক্রীতদাস। দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার পরও সে অন্য কোথাও যায় নি। ছায়ার মতন লেগ্রাণ্ডের সঙ্গে থাকতো।

এই সময় আমি চার্লসটন-এ থাকতাম। নির্জন দ্বীপটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মাঝে মাঝে আমাকে

খাড়ি পেরিয়ে দ্বীপে টেনে নিয়ে যেত। লেগ্রাণ্ড-এর সঙ্গে আমার আলাপ হল, তার ভদ্র, মার্জিত ব্যবহার, কথা বার্তায় খুশী হলাম, বন্ধুত্ব হল। লেগ্রাণ্ড সুশিক্ষিত। তবে আর্থিক বিপর্যয় তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তাকে কখনও হাসিখুশি আবার পরক্ষণে মন মরা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। দ্বীপের বাসিন্দারা তাকে সাধুসন্ন্যাসী পর্যায়ে ফেলেছিল। সে যাই হোক আমার কিন্তু ভালই লেগেছিল তাকে।

লেগ্রাণ্ড কিন্তু তার নির্জন বাসে নিষ্কর্মা হয়ে অতীতের সচ্ছল দিনগুলির আরাম বিলাসের স্মৃতির রোমন্থন করে দিন কাটাতো না। দ্বীপের পূর্ব দিকে এক ছায়াঘেরা জায়গায় নিজের মনের মতন কুটির বানিয়ে সে বাস করতো। তার সঙ্গী ছিল তার পরিচারক-সাথী জুপিটার আর বিশ্বস্ত কুকুর উল্‌ফ। লেগ্রাণ্ড কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের কূলে ঘুরে বেড়াত আর নানা ধরনের শামুক, গেঁড়ি, পোকা-মাকড় সংগ্রহ করে বেড়াত। এণ্টোমোলজি বা পতঙ্গ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তার যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল।

সেটা বোধ হয় ১৮৪০ সাল, অক্টোবর মাস। অনেক দিন লেগ্রাণ্ডের সঙ্গে দেখা করিনি। একটা ব্যাগে কয়েকটা পোশাক আর দরকারী জিনিস নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম সালিভান দ্বীপের দিকে।

বাতাসে শীত শীত ভাব। সূর্যাস্তের কিছু আগে লেগ্রাণ্ডের কুটিরে পৌঁছুলাম। দরজায় ধাক্কা দিলাম সাড়া নেই! দরজার চাবি কোথায় থাকে জানতাম। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরের ভেতরে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে অথচ ঘরে লোক নেই। একটু অস্বাভাবিক চিহ্ন। ভাবলাম কাছে পিঠে কোথাও গিয়েছে। এখনই আসবে। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম।

খানিক বাদেই ওরা দুজনে ঘরে ঢুকলো। আমাকে দেখে জুপিটার আকর্ণ হেসে রাতের খাবার তৈরি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লেগ্রাণ্ডকেও

সমুদ্রের ধারে লেগ্রাণ্ড শামুক সংগ্রহ করছে

দেখলাম খুব খুশি। নতুন ধরনের বৃহদাকার শামুক পেয়েছে। তার চেয়েও সুখবর এক নতুন প্রজাতির স্কারাব, গুবরে পোকা, সে পেয়েছে। প্রাচীন মিসরবাসীরা এই স্কারাবগুলি পবিত্র বলে মনে করতো।

—আমার ধারণা এটা সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির স্কারাব। পতঙ্গ বিজ্ঞানীরা এই স্কারাবের কোন বর্ণনা দিয়েছেন বলে মনে হয় না। কাল তোমাকে

স্ক্যারাবটা দেখাব তোমার মতামতের জন্যে। বললে লেগ্রাণ্ড।

—আজ নয় কেন? জিজ্ঞাসা করি।

—তুমি আজ আসবে আগে যদি জানতাম! বলে ওঠে লেগ্রাণ্ড। অনেক দিন এদিকে আসনি, কি করে জানবো যে তুমি আজ রাতেই এখানে আসবে? বাড়ি ফেরার পথে মৌলট্রি ফোর্টের লেফ্‌টন্যাণ্ট গ্রের সঙ্গে দেখা হল। জানই তো এসব ব্যাপারে ওর খুব আগ্রহ আছে। স্ক্যারাবের কথা শুনে চেয়ে নিলেন, ভাল করে দেখবেন বলে। আমিও বোকার মতন তাঁকে দিয়ে দিলুম। আজ রাতে তো এখানেই থাকবে? কাল ভোরে জুপিটারকে পাঠিয়ে দেব, লেফটন্যাণ্ট গ্রের কাছে। স্ক্যারাবটা দেখে তুমিও চমকে যাবে। এতো সুন্দর যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

— ভাষায় বর্ণনা করা যায় না সুন্দর জিনিসটা কি? এখানে সমুদ্র বুকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য?

—না, না। আমি স্ক্যারাবটার কথা বলছি। উজ্জ্বল সোনালী রং, বড় সাইজের বাদামের মতন। এটার পিছন দিকে দুটো গাঢ় কালো ফুটকি! আর অপর প্রান্তে একটা কালো ফুটকি! শুঁড়গুলো ...

জুপিটার বলে ওঠে, ওটা সোনা দিয়ে তৈরী, মিস্টার বিল। সবটাই সোনা, ডানা দুটো বাদে। এতো ভারী পোকা এর আগে দেখি নি।

লেগ্রাণ্ড বলে ওঠে, বেশ তাই না হয় হল, জুপি। কিন্তু ডিনার যে পুড়ে গেল। যাক যা বলছিলাম। ঝকঝকে সোনার রঙ। গায়ের আঁশগুলো থেকে ধাতব দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। কাল নিজের চোখেই দেখতে পাবে। দাঁড়াও, ছবি এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি পোকাটার চেহারা কি রকম!

লেগ্রাণ্ড ছোট একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো। কালি, কলম আছে কিন্তু কাগজ নেই। পকেট হাতড়ে একটুকরো ময়লা কাগজ বের করলো।

লেগ্রাণ্ডের কুটীরে পৌঁছেছি

—এতেই হবে, বলে কাগজের এক ধারে কালি দিয়ে একটা নক্সা এঁকে, চেয়ার থেকে না উঠে, কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। কাগজটা হাতে নিয়ে আগুনের ধারে চেয়ারটায় এসে বসলাম।

দরাজাটা কে ঠেলছে। জুপিটার দরজা খুলে দিতেই লেগ্রাণ্ডের নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরটা ঘরে ঢুকে সোজা আমার দিকে ছুটে এল। ওর সঙ্গে এর

আগেই ভাব হয়েছে। ওর নাম উলফ। সে আমার কাঁধের ওপর দুটো পা তুলে দিয়ে ঘাড় মুখ চেটে আদর করতে লাগলো। এক হাতে কাগজটা তুলে ধরে অন্য হাতে উলফকে সামলাতে লাগলাম।

উলফ চলে যেতে কাগজটার দিকে নজর দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কাগজটার দিকে চেয়ে আছি। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

পোকার ছবি কোথায়?

লেগ্রাণ্ডের দিকে চেয়ে বললাম তোমার পোকা কোথায় ভাই। এতো দেখছি একটা মড়ার খুলি এঁকেছ।

মড়ার খুলি

লেগ্রাণ্ড চমকে উঠে বলে কি বলছ? আমি কি ছবি আঁকতে জানি না? নিজের হাতে পোকার ছবি এঁকেছি। পোকাটার সামনের দিকে শুঁড় দুটো দেখতে পাচ্ছো না?

বললাম তোমার ছবি আঁকার দক্ষতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করছি না। পোকাটা নিঃসন্দেহে অদ্ভুত আকৃতির, হুবহু একটা মড়ার খুলি। কাল সকালে পোকাটাকে চাক্ষুষ দেখে আমার মতামত জানাবো।

লেগ্রাণ্ড বেশ ক্ষুণ্ণ হল—কাল পোকাটা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। আমি খুব ভোরে জুপিটারকে পাঠিয়ে দিয়ে ওটা আনিয়ে নেবো।...পোকাটা অনেকটা মড়ার খুলির মতন দেখতে। কিন্তু ওর শুঁড় দুটো দেখতে পাচ্ছো না। আমি পরিষ্কার ভাবে দুটো শুঁড় এঁকেছি!

বললাম—তা এঁকে থাকতে পারো, কিন্তু এই ছবিতে তার চিহ্ন মাত্র নেই! বিশ্বাস না হয় নিজের চোখে দেখ।

কাগজটা লেগ্রাণ্ডের হাতে দিলাম। সে সতর্কভাবে কাগজটা দেখছে। ছবিটা সত্যিই মড়ার খুলির। পোকার চিহ্ন মাত্র নেই। শুঁড় নেই!

লেগ্রাণ্ড সোনালী পোকার কথা বলছে

বিরক্ত হয়ে লেগ্রাণ্ড কাগজটা দুমড়ে আগুনে ফেলে দিতে গিয়ে, কাগজের ওপর আঁকা নক্সাটার দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়েই চমকে উঠলো। মুখের ভাব বদলে গেল। সেই টেবিলে বসে অনেকক্ষণ নক্সাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর উঠে গেল—ঘরের এক কোণে একটা কাঠের সিন্দুকের ওপর বসে মোমবাতির আলোতে কাগজটা উলটে পালটে দেখতে লাগল।....ব্যাপারটা কিছুই

বুঝছি না। তবে লেগ্রাণ্ডকে খুবই গম্ভীর আর চিন্তিত দেখলাম। শেষ পর্যন্ত লেগ্রাণ্ড কাগজটা খুব সাবধানে ভাঁজ করে নিজের নোট বইয়ের মধ্যে রেখে দিল। ওদিকের একটা টেবিলের দেরাজ খুলে তার মধ্যে নোট বই রেখে দেরাজে চাবি দিয়ে আবার সেই কাঠের সিন্দুকটার ওপর গিয়ে বসলো।

এরপর লেগ্রাণ্ডের মুখ থেকে একটা কথা বের করতে পারি নি। গভীর চিন্তায় যেন ডুবে আছে। সাধারণতঃ আমি লেগ্রাণ্ডের কুটিরে রাত কাটাই, অনেক রাত পর্যন্ত গল্প গুজব করি। কিন্তু লেগ্রাণ্ড যেভাবে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছে তাতে রাত কাটাবার ইচ্ছেটা উবে গেল। মূল ভূখণ্ডে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

লেগ্রাণ্ড কোন বাধা দিল না। তার হাবভাবে মনে হল, সে এখন একাই থাকতে চায়।

পরের মাসে আমি লেগ্রাণ্ডের কোনও খোঁজ নিইনি। হঠাৎ একদিন জুপিটার এসে হাজির হল আমার চার্লস্টনের বাড়িতে। তার উদ্বেগ

উলফ আব্দার করছে

লেগ্রাণ্ড পোকার ছবি আঁকছে

ভরা বিষণ্ণ মুখ দেখে আমারও ভাবনা হল। লেগ্রাণ্ডের কিছু হল নাকি?

—এসো জুপ! ব্যাপার কি? তোমার মনিবের খবর কি?

—না সার! মনিবের ব্যাপার স্যাপার খুব ভালো লাগছে না!

—কি হয়েছে তার? অসুখ করেছে? কি অসুখ?

—সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। কিছুই তো বলেন না। কিন্তু একটা কিছু যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

—খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে? বলবে তো সে কথা!

—বললুম তো! ব্যাপার কিছু বুঝছি না। মনিব বলেন তাঁর কিছু হয় নি! তাহলে? সারা দিন ঘাড় নীচু করে, কাঁধ তুলে পায়চারি করছেন ঘরের এদিক থেকে ওদিক। মুখ চোখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

—কি হয়েছে খুলে বল জুপিটার। আমি চলে আসার পর কিছু ঘটেছে?

—না সার? আপনি চলে আসার পর খারাপ কিছু ঘটে নি। যা হবার আগেই ঘটে গেছে, আপনি যেদিন বিকেলে গিয়েছিলেন, সেইদিন সকালে!

—কি বলতে চাইছো?

—আসলে ওই গুবরে পোকাটাই যতো নষ্টের মূল। এরকম ত্যাঁদোড় পোকা আমি কখনও দেখিনি। ধরতে গেলে চড়বড় করে, সামনে যা পায় কামড়ে দেয়। মনিবই সব প্রথম পোকাটা ধরেছিল। প্রায় সঙ্গে ছেড়ে দেয়। পোকাটা নিশ্চয়ই সে সময় ওঁকে কামড়ে দিয়েছিল। ওর দাঁড়া দেখে আমি সাবধান হলাম। খালি হাতে ওটাকে ধরার চেষ্টা করিনি। এক টুকরো কাগজ দিয়ে

লেগ্রাণ্ড কাগজটা দেখছে

পোকা কোথায়? মড়ায় খুলি

ওটাকে চেপে ধরলাম, এক টুকরো কাগজ ওর মুখে গুঁজে দিলুম।

—তোমার ধারণা পোকাটা উইলকে কামড়ে দিয়েছিল?

—ধারণা নয় সার—আমি শপথ করে বলবো পোকাটা ওঁকে কামড়ে দিয়েছিল। তা না হলে মনিব এখন সোনার স্বপ্ন দেখেন কেন দিনরাত? সোনালী পোকার কামড় খেয়েই সোনার স্বপ্ন দেখছেন। সোনা ভূত ওঁর ঘাড়ে চেপে বসেছে।

—উইল দিন রাত সোনার স্বপ্ন দেখে, একথা কে তোমায় বললে?

—ঘুমের ঘোরেও সোনা, সোনা বলে চেঁচায় যে !

—ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না জুপ। তা তুমি এসেছ কেন ? কোনও চিঠি দিয়েছে নাকি ?

—হা সার ! মনিব আপনার কাছে এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন !

চিঠিটা হল :

বন্ধুবর,

তোমার সঙ্গে এক মাস আগে দেখা হবার পর এমন কিছু ঘটেছে যা আমাকে গভীর ভাবনায় ফেলেছে। তোমার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে আলাপ করতে চাই কিন্তু কিভাবে তোমাকে বিষয়টা জানাবো, কিম্বা আদৌ তোমাকে কিছু বলবো কিনা তা বুঝতে পারছি না।

কয়েকদিন ধরে আমার শরীর খারাপ যাচ্ছে। জুপ খুবই চিন্তিত আমার জন্যে।

না, নতুন কোন পোকা মাকড় শামুক গুগলি আবিষ্কার করি নি।

যদি অসুবিধা না হয়, জুপিটারের সঙ্গে চলে এসো। আজ রাতেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বিষয়টা খুবই জরুরী।

তোমার উইলিয়াম লেগ্রাণ্ড

এই চিঠি দিয়েছেন

জুপিটার চিঠি নিয়ে এসেছে

চিঠির ভাষা আমার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুললো। অতি জরুরী কি-বিষয়ে লেগ্রাণ্ড আমার সঙ্গে কথা বলতে বা পরামর্শ করতে চায় ? জুপিটারের কথায় আমার আরও ভাবনা হল, টাকাকড়ি সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার চিন্তা, নির্জন বাস, এর ফলে কি উইলের মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে শেষ পর্যন্ত ! ঠিক করলাম জুপিটারের সঙ্গে দ্বীপে যাব লেগ্রাণ্ডকে দেখতে। জুপিটারকে বললাম, নৌকো ঠিক করো। আমি আসছি।

পারঘাটায় পৌঁছে দেখি জুপিটার নৌকোতে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। নৌকোর মধ্যে

কাগজ দিয়ে পোকা ধরছে

তিনটে কোদাল, একটা আঁকশি-কাস্তে সাইদ (লম্বা লাঠির ডগায় খুব ধারালো লম্বা কাস্তের

চিঠি পড়ে উদ্বিগ্ন হলুম

ফলা)। সব কয়টি নতুন, ঝকঝকে। বুঝলাম সদ্য কেনা।

জুপিটার বললে তার মনিবের নির্দেশে সহর থেকে এগুলো কিনে এনেছে—কি কাজে লাগবে সে জানে না।

জুপিটারকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই। নৌকোর পাল তুলে দেওয়া হ'ল। বেলা তিনটে নাগাদ আমরা সালিভান দ্বীপে ফোর্ট মৌলট্রির উত্তরে ডাঙায় পৌঁছালাম। ওখান থেকে দুমাইল পায়ে হেঁটে লেগ্রাণ্ডের কুটিরে পৌঁছালাম। লেগ্রাণ্ড সাগ্রহে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। [চলবে]

* 'এডগর অ্যালেন পো' অবলম্বনে।

মনে রেখো

সোহিনী পাল

নানাসাহেব কে ছিলেন ?

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের (সিপাহী বিদ্রোহের) অন্যতম নায়ক। নির্বাসিত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র ; প্রকৃত নাম ধুন্দুপন্থ।

শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টাকার পরিবর্তে নোটের প্রচলন করেন কে ?

চীন সম্রাট কুবলাই খান (১৩ শতক)।

সর্বপ্রথম মুদ্রা হিসাবে স্বর্ণের প্রচলন করেন কে ?

ক্রিসাস (লিডিয়ার রাজা) খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক।

ইউরোপ হইতে কে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন ?

মহাবীর আলেকজাণ্ডার (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে)।

সারনাথ স্তূপ নির্মাণ করেন কে ?

সম্রাট অশোক। এই স্থানেই বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন এবং সারিপুত্ত মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতি পাঁচজনকে প্রথম শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন।

ভারতের সর্বপ্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন কে ?

শেরশাহ।

বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন কে ?

উত্তর বঙ্গের রাজা গণেশ (খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী)। মতান্তরে পরবর্তী কালে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ (বার ভূঁইঞার অন্যতম)।

বার ভূঁইঞাকে কে ছিলেন ?

যশোরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দরাম, চাঁদপুরের চাঁদ গাজি, বিষ্ণুপুরের হাম্বীর মল্ল, তাহিরপুরের কংসনারায়ণ, পুটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর, ভাওয়ালের ফজল গাজি ও মামুদপুরের সীতারাম রায়।

টলস্টয় কে ছিলেন ?

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক, জ্ঞানে ও চরিত্রে ঋষিতুল্য ছিলেন (১৮২৮-১৯১০ খ্রীঃ)।।

সার টমাস রো কে ছিলেন ?

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় ইংলণ্ডের দূত।

"জঁা ক্রিসতফ" নামক পুস্তকের রচয়িতা কে ?

রোমা রোঁলা (ফরাসী)। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম উপন্যাস বলিয়া পরিচিত।

মাও সে-তুং কে ছিলেন ?

চীনদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। অসাধারণ পণ্ডিত (১৮৯৩-১৯৭৬ খ্রীঃ)। তাঁহারই নেতৃত্বে চীনের লাল ফৌজরা সে দেশের সরকার দখল করিয়া সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

মাইকেল এঞ্জেলো কে ?

ইটালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্কর (১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রীঃ)।

বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন ?

সিরাজউদ্দৌলা।

সক্রেটিস কে ছিলেন ?

প্রাচীন গ্রীসের মহাজ্ঞানী ও দার্শনিক। আজও

জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। যুব সম্প্রদায়কে দূষিত করিতেছেন—এই অভিযোগে বিষপানে তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়।

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন ?
জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯—৯৯ খ্রীঃ)।

জান কী

জাতক কি ?
পালি ভাষায় রচিত বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। ভগবান বুদ্ধ জন্মের বিভিন্ন কাহিনী "জাতক" নামে অভিহিত।

ভারতের "তখৎ-ই-তাউস" কি ?
সম্রাট শাহজাহানের "ময়ূর-সিংহাসন"-এর নাম 'তখৎ-ই-তাউস'। শিল্পী বেবাদল খাঁ এই সিংহাসনটি তৈয়ারি করেন।

পিরামিড কি ?
মিসরের নীল নদের তীরে "ঘিজে" নামক জায়গাটির দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল পর্যন্ত বিশালকায় ত্রিকোণাকৃতি অতি উচ্চ বহু প্রস্তর স্তম্ভ দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন এইগুলি প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। সুপ্রাচীন মিসরের "ফ্যারাও" উপাধিধারী সম্রাটদের সমাধিস্থলে নির্মিত। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পিরামিডটি হইল সম্রাট খুফুরের। ১০ একর স্থানের উপর ৭৫৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং ৪৮২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। এই পিরামিডটি তৈয়ারি করিতে ৭০ মণ ওজনের ২৩ লক্ষ প্রস্তর খণ্ড প্রয়োজন হইয়াছিল।

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া কি ?
কোন প্রাণীর মৃত্যু হইলে পঞ্চভূতে অর্থাৎ ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি) মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)-এ মিশিয়া যাওয়া।

প্যাগোডা কি ?
ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ মন্দিরকে প্যাগোডা বলে।

রাবণের পিতা ও মাতার নাম কি ?
বিশ্বশ্রবা মুনি ও নিকষা।

লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের পুত্রদের নাম কি কি ?
লক্ষ্মণের দুই পুত্র—অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের দুই পুত্র—তক্ষ ও পুষ্কর, শত্রুঘ্নের পুত্রদের নাম—সুবাহু ও শত্রুঘাতী।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা বস্তু কি ?
হাইড্রোজেন গ্যাস।

ভূমিকম্প নির্ণয় যন্ত্রের নাম কি ?
সিসমোগ্রাফ (Seismograph)।

কুলীনের নয়টি গুণ কি কি ?
আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান।

আলেয়া কি ?
পচা জায়গা হইতে এক প্রকার গ্যাস উঠিয়া বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, ইহাকেই আলেয়া বলে।

বুর্জোয়া কি ?
সাধারণভাবে ধনীশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা মিশ্রিত অবজ্ঞাসূচক সংজ্ঞা।

স্যাকারিন কি ?
আলকাতরা হইতে প্রস্তুত অতি মিষ্ট পদার্থ। ইহা চিনি অপেক্ষা নয় গুণ বেশী মিষ্ট।

ফ্রাঙ্কলিন মেডেল কি ?
বৈজ্ঞানিকদের জন্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ভারতীয়দের মধ্যে সার সি. ভি রমন ১৯৪০ সালে এই পুরস্কার লাভ করেন।

ডিক ভ্যান্স লাইসেন্স রিনিউ করেনি!
দুজন স্লোভিয়ান দখল নিতে রওনা হয়েছে
-সেই সঙ্গে আমার স্ত্রীও নিখোঁজ!
স্লোভিয়ানরা ঠিক সময় মতন হাজির, জেনও নিখোঁজ কাকতালীয় ব্যাপার, নয় কি?
ভ্যান্স টাকা খরচ করেছে, খেটেছে কিন্তু....!
লাইসেন্স রিনিউ করলো না কেন?
স্লোভিয়ানরা খোঁজ পেল কি করে?
জিজ্ঞাসা করিনি। -ভুল হয়ে গেছে-
৮

ব্যাপারটা সন্দেহজনক...
-কিন্তু তোমার স্ত্রী-
দুজন স্লোভিয়ান ভান্স আর আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল....
...সৈন্য পাঠাবো...
না, আমিই খোঁজ নেব
তুমি একা?
জঙ্গলের পথ আমি সব চিনি..
ভ্যান্স আর জেনের কোন ক্ষতি না হয়, দেখতে হবে।
...ওরা বন্দী না হলে ঝামেলা নেই।
...ঠিক কথা

প্রতিযোগিতার ফলাফল

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের পাঠক-পাঠিকা যাঁরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলে—তাদের মধ্যে সফল প্রতিযোগীদের নাম নিচে দেওয়া হল।

অংকন প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম (১) দেবরাজ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীবাড়ি (আসাম)
দ্বিতীয় (২) সোমিক দে, সুভাষ রোড (বাঁকুড়া)
তৃতীয় (ক) অদ্রীশ বিশ্বাস, মহেশ কলোনী (হুগলী)
(খ) কৌশিক দাস, রাজমহল রোড (মালদহ)

গল্প লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম (১) পুষ্পেন্দু নারায়ণ লাহিড়ী, কলিকাতা-৩৪ (বেহালা)
দ্বিতীয় (২) দিপেন্দ্র মুখার্জী, পোলক স্ট্রীট (কলিকাতা-১)
তৃতীয় (ক) অরুণাভ রায়, বাল্মীকি স্ট্রীট (কলিকাতা-২৬)
(খ) সুব্রত কুমার দাস, রাঙিয়া স্টেশন রোড (আসাম)

ধাঁধা (ছবিতে) প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম (১) নয়ান চৌধুরী, রথতলা (আসাম)
দ্বিতীয় (২) তনুশ্রী বসু, বোলপুর (শান্তিনিকেতন)
তৃতীয় কৌশিক সেন, কলিকাতা-৭

ছোট্ট বন্ধুরা,

উপরোক্ত ফলাফলে সফল যাঁরা হয়েছো তাদের জন্য মনি-অডার যোগে ১৫৲ টাকা ১০৲ টাকা ও ৫৲ টাকাতোমাদের ঠিকানায় পাঠান হবে।

সম্পাদক / চি. ডি. ১৪।৫।৮২

জুলাই/৮২

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভে

থাকবে

অলৌকিক কাহিনী নিয়ে

রূপকথা সংখ্যা

এই সংখ্যাটি ছোট বড়

সকলের ভাল লাগবেই

আরও আকর্ষণীয় বিভাগে

আরব্য রজনীর অজানা কাহিনী

সঙ্গে পাবে বিদেশী শ্রেষ্ঠ কিশোর-

উপযোগী 'আজব দেশে অ্যালিস'

ধারবাহিক সবই পাবে।

ধাঁধা ও মজার প্রতিযোগিতাও পাবে।

দাম দুটাকাই থাকছে।

চিলড্রেন্স্ ডিটেক্‌টিভ্

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম ও সুযোগ

● বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা। অগ্রিম মনিঅর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ব্যাঙ্কড্রাফট বা ক্রশ চেকে পাঠাবেন। CHILDRENS DETECTIVE নামে। কলকাতার বাইরের চেক নেওয়া হয় না।

● গ্রাহকদের ভিপিতে পত্রিকা না নেওয়াই ভালো—খরচ বেশী পড়ে, টাকা নিয়ে গোলমাল হয় পোস্ট অপিসে।

● রেজিস্টার্ড ডাকে পত্রিকা নিতে হলে বছরে ২০্ বেশী লাগে। অফিস থেকে হাতে করে পত্রিকা নিতে হলে সেকথা আগে জানিয়ে দিতে হয় এবং প্রতি ইংরেজী মাসের ১০ তারিখ নাগাদ চাঁদার রসিদ দেখিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ করতে হয়।

● ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ১৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে লিখিতভাবে P. M. G, W. B. Circle, Calcutta-1 ঠিকানায় অভিযোগপত্র পাঠিয়ে তার অনুলিপি পত্রিকা অফিসে পাঠাবেন। তাহলে আর এক কপি পত্রিকা দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

● গ্রাহক হলেও বিশেষ সংখ্যা, পূজা সংখ্যা, বড়দিন সংখ্যা, প্রভৃতির জন্য বেশী দাম দিতে হয়।

এজেণ্ট হওয়ার নিয়ম

● চিলড্রেন্স ডিটেক্‌টিভ পত্রিকার এজেণ্ট হতে হলে ১০ টাকা জমা রাখতে হয়। এক মাস আগে জানিয়ে এজেন্সী ছাড়লে ঐ টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

● কমপক্ষে ৫ কপি প্রতি সংখ্যা নিতে হয়।

● টাকায় ২৫ পয়সা কমিশন দেওয়া হয়।

● ভিপিতে পত্রিকা পাঠানো হয়; ভিপি খরচ বহন করা হয়।

● ভিপি প্রত্যাখ্যান করলে এজেন্সী জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করে এজেন্সী বাতিল করা হয়।

॥ চিলড্রেন্স্ ডিটেকটিভ্ ॥ ২৬ স্ট্রাণ্ড রোড ॥ কলিকাতা-১ ॥ ফোন : ২২-২৭৭০

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—৪৪৩৪।৮২

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের
আগামী সংখ্যায় থাকবে

কিশোরদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞান সংখ্যা

বিশেষ আকর্ষণের একটি

আইনষ্টাইন

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবন ও কর্মের এক সচিত্র কাহিনী
লিখবেন : নামী ও দামী লেখকেরা। দাম একই থাকবে।

সেরা একটি সচিত্র কাহিনী

জুলে ভার্ন-এর পৃথিবী থেকে চাঁদে

এ ছাড়া আকর্ষনীয় বিভাগ ও অন্যান্য রচনা

টারজনকে নিয়ে-(কমিকস) এবং বিষাক্ত ওষুধ রহস্য

মনেরেখোর বিজ্ঞানের প্রশ্ন মালা

ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ছবিতে
ঠিক সময় তোমাদের হাতে মাসের প্রথম সপ্তাহেই তুলে দেব।

দাম দু'টাকাই থাকবে।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ : ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড : কলিকাতা-৭০০০০১ : ফোন ২২-২৭৭০

Regd. No. R. N, 32660/77 CHILDRENS' DETECTIVE :: MAY 82 Rs. 2/- WBSC-135

কি ভাবছেন?

ছেলেমেয়ের লেখাপড়া?
কন্যার বিবাহ?
অথবা
ভবিষ্যতের নিরাপত্তা?
আজই
ফেবারিট
সঞ্চয় প্রকল্পে
যোগ দিন
সেবা
ও
সঞ্চয়ের
একমাত্র
প্রতীক

ফেবারিট
স্মল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
হেড অফিস:
৮৩, পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০১৬,
ফোন ২৪-৬৬৫৩, ২৪-৭২৮১
২১-৩৫৮৮
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মসচিব
শ্রী এন, দে

SOHINI PRAKASHANI : Phone : 22-2770 : Chief Editor, Amitava Sen
Printer. Publisher & Editor, Mahindra Bose from 26, Strand Road, Cal-1
Printed at Impression & Jayasree Press—Cal-6, Block Royal Halftone Co.
Cover Printed by New Gaya Art Press, Cal-9, Phone : 34-3493